ধর্ম ও রাজনীতি নিরপেক্ষ একুশের সংকলন

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২। নিউইর্য়ক। প্রথম সংখ্যা

CHANNEL 786 COMMUNITY NEWS NETWORK

একুশ

৫ টি প্রবন্ধ
৫ টি গল্প
৫ টি স্মৃতিচারন

নিউইর্য়ক বইমেলা
খলিলের রেসিপি

মডেল আফরা এবং আইদা, টরন্টো, কানাডা

বাংলা চর্চা সংস্কৃতি আছে ভাষা নেই ● জাতিসংঘে শহীদ মিনার ● প্রবাসে বাংলা চর্চা

gTalk® PBX

Business Phone Service

www.GTALKPBX.com

Reliable | Economical | Smart

gPlex® Contact Center

Call Center Solution

www.GPLEX.com

Robust | User Friendly | Easy to Deploy

SAVE UPTO %60

ON YOUR BUSINESS PHONE & CALL CENTER COSTS

gTalk® BPO Service

Business Process Outsourcing from Bangladesh

- ✓ Telephone Answering Service
- ✓ Telemarketing
- ✓ Backoffice of your business in Bangladesh
- ✓ And many more

For a FREE no obligation quote-

Call: (481 (866-7/24) 1010) | Email: sales@gtalkpbx.com

Genusys Inc. DBA gTalk & gPlex | 209 State Highway 121 Bypass, Ste 31, Lewisville, TX 75067 www.genusys.us | (318 (972-2900

সম্পাদকীয়

ধর্ম ও রাজনীতি নিরপেক্ষ
একুশের সংকলন

বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলী
ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ
সুরমা জাহিদ
লিলি হক
রওশন হক
শেলী জামান খান

সম্পাদক
মুক্তি জহির

প্রকাশক
চ্যানেল ৭৮৬
নিউইর্য়ক যুক্তরাষ্ট্র

হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালে বের হয় একুশের প্রথম সংকলন "একুশে ফেব্রুয়ারী"। এরপর থেকে একুশের ফেব্রুয়ারি, ভাষা দিবস, শহিদ দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে হাজার হাজার সাহিত্য সংকলন। যারা দেশের বাইরে থাকেন তারাও পিছিয়ে নেই। যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত বাংলা টেলিভিশন চ্যানেল ৭৮৬ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০২২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে "প্রবাসে বাংলাচর্চা" বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে "বাংলা" শিরোনামে একটি সংকলন প্রকাশ করবে। চ্যানেল ৭৮৬-এর সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে, সেজন্য আমি সম্মানিত বোধ করছি। ধর্ম এবং রাজনীতিনিরপেক্ষ এই সংকলনে প্রবাসে বসবাসকারী লেখকদের প্রাধান্য দেওয়া হলেও বাংলাদেশ এবং ভারতে বসবাসকারী বাঙালি লেখকদের লেখাও সন্নিবেশের চেষ্টা করা হয়েছে। গল্প, কবিতা, কাব্যালেখ্য, প্রবন্ধ, ছড়া সবই রাখা হয়েছে। কাজটি করতে গিয়ে বেশ আনন্দ অনুভব করেছি এজন্য যে, যার কাছেই সহযোগিতা চেয়েছি তিনিই সানন্দে সাড়া দিয়েছেন। কেউ বিমুখ করেননি। এই উৎসাহ আমাকে/আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে আগামী দিনে এমন সৃষ্টিশীল কর্মপ্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে । খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাজটি করতে হয়েছে বিধায় কিছু মুদ্রণ-ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা অস্বীকার করি না। আশা করি পাঠক তা ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

মুক্তি জহির
২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

Mannan

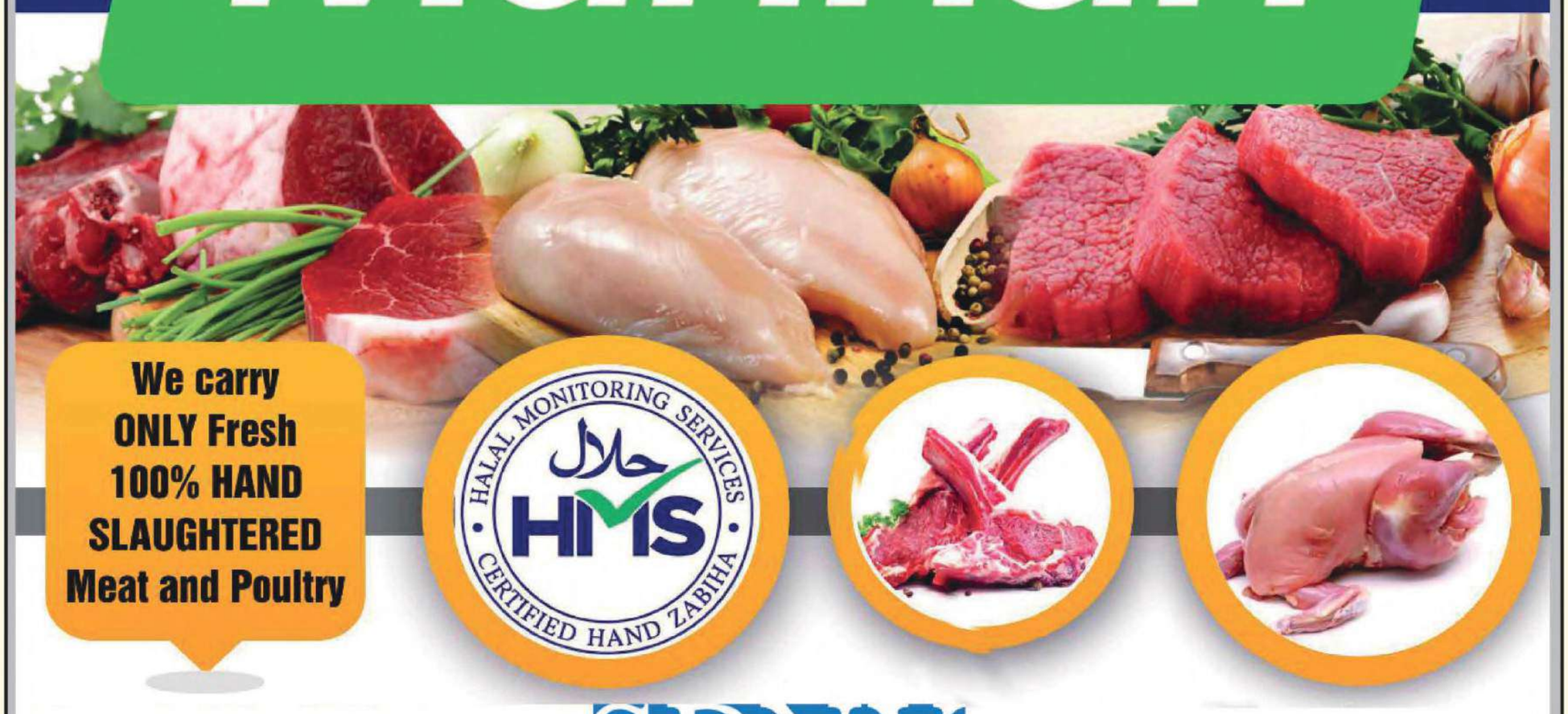

We carry
ONLY Fresh
100% HAND
SLAUGHTERED
Meat and Poultry

HALAL MONITORING SERVICES
حلال
HMS
CERTIFIED HAND ZABIHA

SBNY
Shariah Board New York

SUPERMARKET
24 HR / 7 DAYS OPEN

NOW OFFICIALLY CERTIFIED BY HMS (HALAL MONITORING SERVICES)
A SERVICE OF SHARI'AH BOARD OF AMERICA

এখন আনুষ্ঠানিকভাবে এইচএমএস (হালাল মনিটরিং সার্ভিসেস) দ্বারা প্রত্যয়িত
আমেরিকার শরিয়াহ বোর্ডের একটি পরিষেবা

HMS certified means:

- Properly hand slaughtered by Muslim
- Bismillah on each animal
- No machine slaughtered meat
- Random, unannounced inspections are conducted frequently by scholars
- Business premises, invoices, merchandises, sales/production records, fridges, etc are inspected to guarantee no mixing with non-halal
- Ingredients and processes of all products/menu items are fully inspected to ensure purely halal
- The whole chain of supply is monitored, from the slaughterhouse to the supplier to the store

এইচএমএস(HMS) প্রত্যয়িত মানেঃ

- সঠিকভাবে মুসলমানের হাতে জবাই করা।
- প্রতিটি প্রাণীর জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ্ বলা।
- মেশিনের মাধ্যমে জবাই না করা।
- প্রায়ই পরিদর্শক দ্বারা আকস্মিক ও অঘোষিত পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়।
- ব্যবসায়িক স্থান, চালান, পণ্যদ্রব্য, বিক্রয়/উৎপাদন রেকর্ড, ফ্রিজ, ইত্যাদি পরিদর্শন করা হয় যাতে হারাম পন্যের সাথে হালাল পন্য মেশানো না হয়।
- সম্পূর্ণরূপে হালাল নিশ্চিত করতে সমস্ত পণ্য/মেনু আইটেমগুলির উপাদান এবং প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিদর্শন করা হয়।
- কসাইখানা, সরবরাহকারী থেকে শুরু করে দোকান পর্যন্ত সরবরাহের পুরো চেইনটি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

ALL LOCATIONS !!!:

Mannan Halal Supermarket
37-19 73rd St.
Jackson Heights, NY 11372
(718) 255-1137

Mannan Bakery
71-14 35th Ave.
Jackson Heights, NY 11372
718-424-0262

Mannan Bakery
167-15 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
718-374-3679

Mannan Supermarket
166-11 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
718-657-4585

Mannan Halal Supermarket
75-19 101st Ave.
Ozone Park, NY 11416
718-848-0895

Mannan Sweets & Restaurant
75-13 101st Ave.
Ozone Park, NY 11416
718-480-6880

Mannan Halal meat
37-08 73rd St.
Jackson Heights, NY 11372
718-426-9899

Email: mannancustomercare@gmail.com

Follow us on: @mannanusa @mannanusa

PLEASE COME VISIT OUR STORES AND LET US SERVE YOU

সূচীপত্র

একুশের কাব্যালেখ্য

রক্তের দাম দিয়ে কিনেছি মায়ের ভাষা-০৪
কাজী জহিরুল ইসলাম

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

বাংলা ভাষার বিজয় বৈজয়ন্তী-০৮
অধ্যাপক ড. মোস্তফা সারওয়ার

প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার সংকট-১০
আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

কবিতার উপায় ও উপকরণ-১২
অধ্যাপক ড. দিলারা হাফিজ

নিউইয়র্কে বাঙালিদের সংগঠন ও সংবাদমাধ্যম-১৮
অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

আমার পরিচয়-২১
দিমা নেফারতিতি

গল্প

যেন হৃত যেন বিস্মৃত সংগ্রাম-২২
ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

চিত্রাঙ্গদা নয় কেউ-২৫
ড. পূরবী বসু

বাঘের আঁচড়-৩১
নূর কামরুন নাহার

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

ভিয়েতনামের নির্বাসিত কবি ও শান্তিকর্মী থিক ন্যাট হানের দর্শন ও কবিতা-৩৫
উপালি শ্রমণ

প্রবাসে লালিত মাতৃভাষা এবং ডায়াস্পরা সাহিত্য-৩৮
শেলী জামান খান

বর্ণমালার সুখ দুঃখ-৪১
নাসিমা আক্তার

প্রবাসে বাংলাচর্চার প্রতিবন্ধকতা-৪২
হাসান আমজাদ খান

লার্নিং ফ্রম বার্নিংঘাট-৪৪
রওশন হক

প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চা-৪৭
এন্থনি পিউস গোমেজ

হারালো কোথায় সেই দিনগুলো-৫০
তাজনীন আমান

আবৃত্তি কেন করি : আবৃত্তিতে শিল্পীর স্বাধীনতা-৫১
রেজা অনিরুদ্ধ

এপারে-ওপারে বাংলা ভাষা কোন পারে?-৫২
এইচ বি রিতা

বাংলা ভাষা এখন বিশ্বভাষা-৫৪
জাহিদা আলম

কবিতা/ছড়া-৫৫-৬১

বিশ্বাস করুন
আতাহার খান

কবরের দশতলা
সালেম সুলেরী

ভাষাজ্বর
সৌমিত বসু

বিহঙ্গ বাসনা
ফেরদৌস সালাম

অনাবশ্যক
নাসরীন নঈম

অসমাপ্ত প্রেমের কবিতা
খসরু পারভেজ

পুলক বারান্দা
মামুন জামিল

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেম
শাকিল রিয়াজ

কথার আনন্দ তাঁদের জীবনে নয়
বাদল ঘোষ

পুড়ে যাচ্ছ
তূয়া নূর

মাতৃভাষা বাংলা
তাহমিনা সুলতানা

আমার বাংলাদেশ
মারজানা সাবিহা শুচি

নব বাল্যশিক্ষা
ড. লোকানন্দ ভিক্ষু

ভাষার আকাশে ময়ূরপঙ্খী
অর্ঘ্য রায় চৌধুরী

ভুলের মাশুল
ড. ধনঞ্জয় সাহা

গল্পকথন

লোহিত জমিন-৬২
কেয়া চ্যাটার্জী

গল্প

উন্মোচন-৬৪
রুবানা ফারাহ্ আদিবা

গল্পের গল্প-৬৬
মিতা হোসেন

জীবনের ঘাটে বাঁধা দ্বিধার নৌকো-৬৮
রাজিয়া নাজমী

প্রতিবেদন

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরষ্কার ২০২১ কারা পেলেন- ৭০
জাহান অরন্য

কাজী জহিরুল ইসলাম

এ-বিশাল পৃথিবীতে একটিই জাতি আছে
জীবনের দাম খুবই তুচ্ছ ভাষার কাছে
রক্তের দাম দিয়ে কিনেছি মায়ের ভাষা
গল্প, কবিতা, গানে ভাষাখানি আছে ঠাসা।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাস। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ এক লিখিত বক্তৃতায় সম্ভাব্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে মত দেন। এর তীব্র বিরোধিতা করেন ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় যুবকদের কর্মী সম্মেলনে ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের আইন-আদালতের লিখিত ভাষা বাংলা করার প্রস্তাব করেন। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের সভায় বাংলা ভাষার দাবি তোলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই দাবির পক্ষে ঢাকায় শুরু হয় আন্দোলন। কিন্তু সব কিছু ধূলিসাৎ করে দিয়ে ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'উর্দু, এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'।

শুরু হয় তীব্র আন্দোলন। কেঁপে ওঠে ঢাকার রাজপথ। পার হয়ে যায় চার বছর। এরপর আসে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। ১৪৪ ধারা ভেঙে বাংলা ভাষার দাবিতে রাজপথে নেমে আসে ছাত্র-জনতা। পুলিশের ক্রুদ্ধ বন্দুক গর্জে ওঠে। মায়ের ভাষার দাবিতে বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেয় বাংলার দামাল ছেলেরা। সেই থেকে-

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ বাংলা ভাষার দিন যে
রক্তে যাদের এ-দিন কেনা তাদের কাছে ঋণ যে
বরকত এবং সফি, রফিক প্রাণ যে গেলো সব্বার
রক্ত দিলো বীর যোদ্ধা ভাষা শহিদ জব্বার
রিক্সাচালক আউয়াল এবং কিশোর অহিউল্লা
ওরাও যে রক্ত দিলো সেই কথা কি ভুল্লা?
বর্ণমালায় লেগে আছে আমার ভাইয়ের রক্ত
বাংলা ভাষার গান কবিতার তাই তো এমন ভক্ত।
রক্তে কেনা বর্ণমালা এ-অক্ষর অমূল্য
আর কি এমন ভাষা আছে বাংলা ভাষার তুল্য?
এ-বর্ণে রোজ কথা বলি কাঁদিও এ-বর্ণে
কী অমৃত বর্ণধ্বনি আসছে ভেসে কর্ণে।

ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে পুলিশের গুলিতে রাজপথে লুটিয়ে পড়েন রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত। পরদিন, ২২ ফেব্রুয়ারি শহিদদের

গায়েবি জানাজাকে কেন্দ্র করে সারা ঢাকায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে তীব্রতর আন্দোলন। সেদিন মিলিটারির ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে নিহত হন রিকশাচালক আউয়াল, পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শিশু অহিউল্লা এবং কোর্টের কর্মচারী সফিউর।

বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শোধ করেছি দাম
কি কিনেছি? কি কিনেছি?
এই যে দেখো বর্ণমালা,
বাংলা এনেছি
ভাষা শহিদ, বাংলা ভাষার যোদ্ধা সে, সালাম।

থমথমে ভোর গুমট শহর বক্ষে নীরব ভার
গর্জে ওঠে ভাষার শপথ
দুপুর রোদে হচ্ছে সরব
আস্তে-ধীরে পথ
ভাষার মিছিল, প্রাণ দিয়েছে নির্ভয়ে জব্বার।

রাজপথে লাল রক্তে আঁকা ভাষার দস্তখত
কে এঁকেছে ঢাকার বুকে?
প্রাণ দিয়েছে পশ্চিমাদের
ক্রুদ্ধ বন্দুকে
ভাষা শহিদ বাংলা ভাষার যোদ্ধা সে বরকত।

বাংলা ভাষার উঠলো দাবী কাঁপলো দিগ্বিদিক
মস্তকে কার লাগলো গুলি
বর্ণমালায় রক্তমাখা
উষ্ণ অঙ্গুলি
ভাষা শহিদ বাংলা ভাষার যোদ্ধা সে রফিক।

হে দুখিনী বর্ণমালা কোথায়, কতদূর?
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
ভাষার দাবী গর্জে ওঠে;
কাঁপছে চতুর্দিক
বুকের তাজা রক্ত দিলো শহিদ সফিউর।

রক্তে রাঙা পলাশ ফাগুন, ভাষার দাবী লাল
মিলিটারির ট্রাকের চাকায়
পিষ্ট হলো দিন-দুপুরে
ফেব্রুয়ারির রুদ্র ঢাকায়
ভাষা শহিদ রিক্সাচালক দরিদ্র আউয়াল।

যে শিশুটি আঁকতো ছবি তার কথা ভুল্লা?
তখনো তার বুক-পকেটে
ছবির পাতা, বর্ণমালা
তীব্র রোষে যাচ্ছে ফেটে
সে আমাদের ভাষাশহিদ বীর অহিউল্লা।

১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি। পাকিস্তানের গণপরিষদ বাংলা ভাষাকে অনুমোদন দেয়। শাসনতন্ত্রে গৃহীত হয় "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা"। এখনো পর্যন্ত সাত ভাষা শহিদের নাম জানা গেলেও রাজমিস্ত্রীপুত্র কিশোর অহিউল্লা এবং রিকশাচালক আউয়ালের মেলেনি কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি।

অহিউল্লার চিৎকার লিখবো বলে
হেঁটেছি শোকের সমান আয়ুপথে
খুঁজেছি উপযুক্ত শব্দ, যতিচিহ্ন
কোন ভাষা, কোন শব্দ,
কোন অক্ষর বেজে ওঠে আজো অহিউল্লার রক্তে

কোন যতিচিহ্নে এ রক্তপ্রবাহ থেমেছিল?
দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, আশ্চর্যবোধক চিহ্ন?
না,
এর সবইতো ভিনদেশি
এইসব যতিচিহ্ন আমার নয়।

খরতপ্ত দুপুরে হন্তারক ফাগুন
কোন সুরে ডেকেছিল কিশোর অহিউল্লাকে?
মায়ের ক্রন্দন থেকে গর্জে ওঠে যে নদী
কোন তটরেখায় তা আছড়ে পড়ে মিছিলবিকেলে?

আমি খুব স্পষ্টতই দেখতে পাই
অহিউল্লার রক্তস্রোতে ভেসে গেছে ভিনদেশি কমা
উড়ে গেছে দাঁড়ির মিছিল
সেমিকোলনগুলো গলে গলে পড়ছে
আশ্চর্যবোধক কপালের ভাঁজ তলিয়ে গেছে
রক্তনদীর অতল গহনে
অহিউল্লার অজেয় রক্তস্রোত বালির বাঁধের মতো উড়িয়ে দিয়েছে
প্রশ্নবোধক চিহ্নের ঝাঁক।

অহিউল্লা, হে বীর, হে তরুণ ভাষাসৈনিক
তোমার বক্ষবিধৌত রক্তস্রোতবন্দনাশিল্পকাব্য
কোনো ধার করা যতিচিহ্নে থামানো যাবে না জানি
এই কবিতাটির জন্য তাই দরকার
বদ্বীপের মতো উজ্জ্বল বাংলা ভাষার নিজস্ব এক অশ্রুযতিচিহ্ন।

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আমরা পেয়েছি বাংলা ভাষা। একুশের চেতনা হয়ে উঠেছে বাঙালি জাতির চেতনার সূতিকাগার। এই চেতনার হাত ধরে এসেছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা।
আজ স্বাধীন দেশের কবিরা, লেখকেরা, প্রাণ খুলে বাংলা ভাষায় লিখছেন হাজারো গল্প, কবিতা, গান। তবু বারবার মনে পড়ে সেই উদ্বিগ্ন রাতের কথা।

উদ্বিগ্ন রাতের কথা বলতে এসেছি এত দূর
থেকে নগ্ন পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে সহস্র মাইল
বিক্ষত পায়ের রক্তে রাঙা গ্রাম্য পথের আইল
পীচঢালা শহর, শোকার্ত রমনা ও সূত্রাপুর।
সে-রাতে হায়েনা দিয়েছিল ঝাঁপ বাঙলা ভাষার
বুক লক্ষ্য করে। নখের আঁচড়ে করেছিল ক্ষত
মায়ের শরীর। কেঁদেছে মা সারারাত অবিরত।
দেখো কালসিটে, নখের আঁচড়, ঘৃণার পাহাড়।
ওরা নেমে এলো রাজপথে প্রতিবাদের অধিক
ভালোবাসা, 'না, মানি না, মানবো না' স্লোগানে মুখর।
স্বৈরশাহীর হুকুম, 'চালাও গুলি, করে দাও স্তব্ধ।'
স্তব্ধ হয়েছিল বটে, বরকত, সালাম, রফিক,
জব্বার। রক্তের নদী প্রিয় মাটি, ঢাকার শহর
এভাবেই আমাদের হলো বাংলা ভাষা, প্রিয় শব্দ।

আমাদের চেতনার তীর্থ ঢাকার শহিদ মিনার। বাঙালির প্রাণের মিনার। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি এলে ভাষার প্রতি, ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লক্ষ মানুষের ঢল নামে। নগ্ন পায়ে আমরা অংশ নিই ভোরের প্রভাতফেরিতে। নতুন প্রজন্মের শিশুরা জানতে চায় তাদের পিতার কাছে, বাবা, কী হয়েছিল এখানে? কেন আমরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই শহিদ মিনারে?

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ কি হয়েছে বাবা?
কাকে বলে প্রভাতফেরী?
সাত-সকালে নগ্ন পায়ে কোথায় তুমি যাবা?

মা গো তখন বাংলাদেশের শাসক ছিল ভিন্ন
উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা বাংলাটা নিশ্চিহ্ন
এই মাটিতে তখন নাকি বাংলা ভাষার দিন না
এই ঘোষণা দিয়েছিলেন পাকিস্তানের জিন্নাহ।

মায়ের ভাষা যাচ্ছে মুছে সে-তো হবার নয়
কেমন করে মানবে ওরা এমন পরাজয়?
প্রতিবাদে মুখর হলো ঢাকার সড়কগুলো
কিন্তু শাসক শুনলো না তা কর্ণে তাদের তুলো
রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে উঠল দাবী শক্ত
ছাত্র যুবক ঢেলে দিলো বুকের তাজা রক্ত
রক্ত দিল বরকত এবং রফিক, সালাম, জব্বার
বাংলা ভাষা তাই হয়েছে বাংলাদেশের সব্বার
সালটা ছিল বাহান্ন আর ফেব্রুয়ারি মাস
একুশ তারিখ রক্তে লেখা ভাষার ইতিহাস।

তখন থেকে পবিত্র এই প্রাণের শহিদ মিনার
বিষণ্নতার সুর বাজে রোজ শোকের করুণ বীণার
সেই থেকে শোক বীর বাঙালীর মূল চেতনার শক্তি
ফুলে ফুলে আমরা জানাই ভালোবাসা, ভক্তি।

একুশ তারিখ সকালবেলা তাই করি না দেরি
ডাক দিয়েছে শহিদ মিনার ডাকছে প্রভাতফেরী...

বাংলা ভাষার বিজয় বৈজয়ন্তী

অধ্যাপক ড. মোস্তফা সারওয়ার

বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি রক্ষা ও বিকাশের আন্দোলন হয়েছিল ১৯৪০ সালে মানভূমে। মানভূম বিভক্ত হয়ে এক অংশ প্রথমে চলে গিয়েছিল বিহারে, পরে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে। অন্য অংশ পুরুলিয়া নামে যোগ হয়েছে পশ্চিম বাংলায়। রাজনৈতিক বিভাজন অথবা সংযোজন সাধারণত প্রতিষ্ঠিত ভাষাকে আহত করলে করতেও পারে, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটানো কঠিন কাজ।

মানভূমের উল্লেখের আরও একটি কারণ রয়েছে। কাছেই রয়েছে বীরভূম। এখানে জন্ম হয়েছিল বড়ু চণ্ডীদাসের। আদি বাংলা ভাষার লিখিত নিদর্শন হলো চৌদ্দ শতকের বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
১৯৪০ সালে মানভূমে যখন চলছিল বাংলা ভাষা আন্দোলন। প্রায় একই সময়ে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল অবিভক্ত বাংলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে গঠিত হবে সার্বভৌম দেশ। লাহোর প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন আবুল কাসেম ফজলুল হক। পরবর্তী সময়ে ১৯৪৬-৪৭ সালে শরৎ চন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কিরণ শঙ্কর রায় ও আবুল হাশেম সার্বভৌম যুক্ত বাংলাদেশ গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। বিবিধ চক্রান্তে তা ভণ্ডুল হয়ে গেল।

রাজনৈতিক বিভাজনের পরও আজ বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা, বাংলাদেশসংলগ্ন আসাম ও মনিপুরের বিস্তৃত অঞ্চল, পশ্চিম বাংলা পার্শ্ববর্তী বিহার ঝাড়খণ্ড ছত্তিসগড় উড়িষ্যার কিছু অংশ, মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এবং গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অভিবাসী বাঙালি হৃদয় জুড়ে বাংলা ভাষার বিজয় ডঙ্কা ধ্বনিত হচ্ছে। এথনোলগ-কে উল্লেখ করে উইকিপিডিয়া প্রাথমিক ভাষায় কথা বলার পরিসংখ্যানে বাংলা ভাষাকে দিয়েছে পঞ্চম স্থান। ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ত্রিশ কোটি লোক বাংলায় কথা বলে।

মানভূম-বাংলা ভাষা আন্দোলনের সাত বছর যেতে না যেতেই পূর্ব বাংলায় শুরু হলো ভাষা আন্দোলন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হলো বাঙালির রক্তে। ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ক্ষীণ বহ্নিশিখার জন্ম হয়েছিল সে আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল ১৯৭১ সালের ৯ মাসের রক্তঝরা স্বাধীনতা যুদ্ধে। লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল।

বাংলা ভাষার প্রতি নিদারুণ মমতা ছিল এই বিজয়ের কেন্দ্রভূমিতে। এই বহমান আন্দোলনের সফল ফলশ্রুতি হলো বাংলাদেশে ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন। এই আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ভাষা শহিদদের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। যখন শুনতে পেলাম, তখন গর্বে আর অহংকারে নক্ষত্রের রাজ্যে অবগাহন করছিলাম। যে নিভৃতচারী পরবাসী বাঙালিরা সার্থক উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের জন্য রইল আমার অন্তরতম শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বাংলা ভাষা তুলনামূলকভাবে একটি তরুণ ভাষা। যার জন্ম ১৩০০ বছর আগে। পূর্ণাঙ্গ বাংলা হরফে উৎকীর্ণ লিপির প্রমাণ মিলেছে ১১৯৬ সালের ডোম্মনপালের সুন্দরবন তাম্রলিপিতে। আধুনিক রূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তরুণ ভাষা। কিন্তু তার বিজয় তুর্য অলৌকিকতাকেও হার মানায়। নব জন্ম লব্ধ শিশু ভাষা ১৯১৩ সালে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল পৃথিবীর অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষার দেশগুলোকে। জাপান, চীন, পর্তুগাল, ইরান, আরবি ভাষার দেশগুলো, পূর্ব ইউরোপ, তুর্কি ভাষাভাষী দেশসমূহ, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা-এদের কেউ সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পায়নি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আগে। এই বিজয়ের কথা মনে হলে বর্তমানে আমার প্রার্থিত নির্বাসনের কোভিড জর্জরিত বন্দিদশার নির্জনতায় প্রাণ ভরে শুনি অতুল প্রসাদ সেনের চিরায়ত সংগীত

“

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ-মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে,
তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালোবাসা!

”

নিদারুণ অহংকারে এতক্ষণ আমার বিচরণ ছিল নক্ষত্রের রাজ্যে। ঐ অর্জনগুলো ছিল অতীতে। এখন প্রশ্ন হলো বর্তমানে কী ঘটছে। বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ কী? আজ সীমিত কলবরে আমি কয়েকটি বিষয় স্পর্শ করব সংক্ষিপ্ত আলোচনায়।

ভাষা হলো একটি জীবন্ত প্রাণীর মতো। নিয়ত পরিবর্তনে এর অমোঘ বিহার। এক ভাষা অন্য ভাষা থেকে আহরণ করে শব্দের রত্ন ভাণ্ডার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পৃথিবী থেকে মহানন্দে গ্রহণ করে নব আবিষ্কার। বিবর্তনের ধারায় নবপ্রাপ্তিকে আপন করে ঘরে তুলে নিতে থাকে। কবিগুরুর ভাষায় "দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে।" বাংলার উপঢৌকন অন্যের দুয়ারে পৌঁছে দিতে অনুবাদের ওপর জোর দিতে হবে। ভালো অনুবাদ হলে নজরুল, তারাশংকর, জীবনানন্দ, শামসুর রাহমান, জয় গোস্বামীসহ আরও অনেকের সাহিত্যে নোবেল বিজয়ের সম্ভাবনার দিকটি উড়িয়ে দেওয়া যেত না।

স্থান কালের অমোঘ ধারায় ভাষার পরিবর্তন এবং বিভিন্নতা অনিবার্য। তবুও ভাষার মানদণ্ড থাকতে হবে। ইংরেজি, ফরাসি ভাষা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলছে। তাই উপসংহারে আমার প্রস্তাব: বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, পার্শ্ববর্তী বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল, বাঙালি ডায়াসপোরা মিলে একটি একাডেমি গঠন করা হোক। যার প্রধান দায়িত্ব হবে হাজারো বিভিন্নতার মাঝেও একটি মানদণ্ড রক্ষা করা।

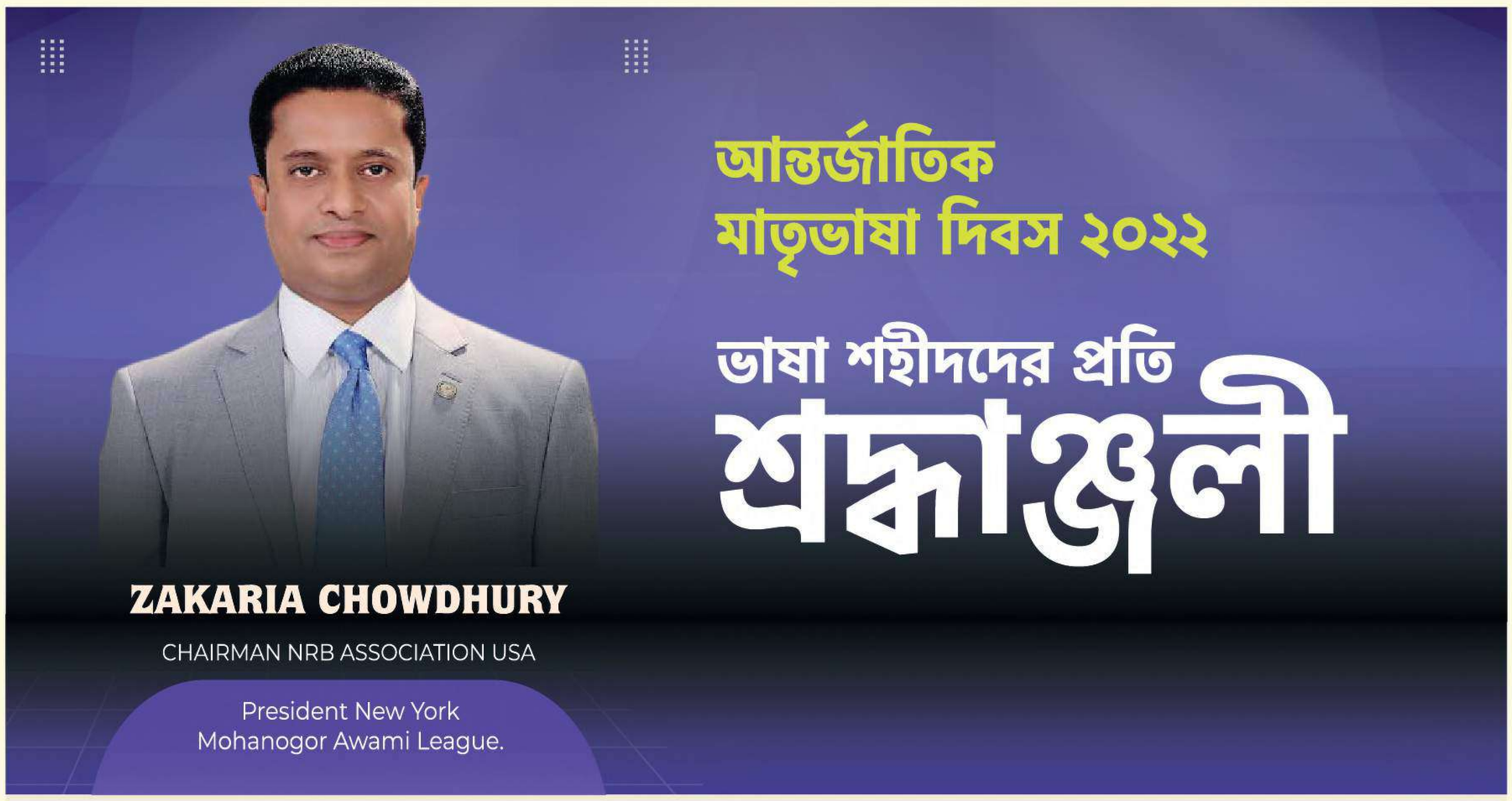

প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার সংকট

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

একটি কমিউনিটি সংবাদপত্রে টানা এগারো বছর কাজ করার সুবাদে সকল শ্রেণির প্রবাসী বাংলাদেশির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যোগাযোগের সুযোগ ঘটেছে। তাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের অধিকাংশ বোঝাতে চান যে, তারা বাংলা লিখতে ভুলে গেছেন। তারা বলতে চান, 'বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছি তো, বাংলা গুছিয়ে লিখতে পারি না।' এটা শুধু আমেরিকায় থাকার দোষে নয়, বাংলাদেশে অনেক সচিব বা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকেও দেখেছি তারা বাংলায় ডিকটেশন দিতে পারেন না। অধস্তনদের বিষয়বস্তু বলে নোট তৈরি করতে বলেন, এরপর ধাপে ধাপে সেটি ওপরে উঠতে উঠতে সচিব মহোদয়ের টেবিলে আসে এবং তিনি চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হলে আবার ধাপে ধাপে নিচে নামতে নামতে যখন সহকারী সচিবের টেবিলে ফিরে আসে তখন তিনি সেটি স্বাক্ষর করে জনস্বার্থে জারি করেন। বাংলাদেশেই যখন এই অবস্থা তখন প্রবাসে 'দ্যাটস ইট,' এর মধ্যে বাংলাচর্চা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়া দোষণীয় কিছু নয়। 'দ্যাটস ইট' নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উল্লেখযোগ্য অংশের মুখে উচ্চারিত প্রিয় দুটি শব্দ। বাংলা ভাষার উদারতা আকাশসম এবং সেজন্য যেকোনো ভাষার শব্দ সহজে ঢুকে পড়ছে। শুধু ভাষা কেন, কত জাতি, গোত্র, বংশ বাংলায় লীন হয়েছে, সেখানে ভাষা লীন হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন:

"হেথা আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন/শক-হুন-দল পাঠান-মোগল-এক দেহে হল লীন। ...এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান/এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।"

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অবস্থা সহজে অনুমান করা যায়। কিন্তু উৎসাহী মানুষের অভাব নেই। দেশের মতো প্রবাসেও সাহিত্যচর্চায় ভাটা পড়েনি। বেশকিছু সাহিত্য সংগঠন প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তুলে ধরতে তৎপর। তারা নিয়মিত সাহিত্য অনুষ্ঠান করেন। মহান একুশে উপলক্ষে জাঁকজমকের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেন। বহু বছর ধরে নিউইয়র্কে বার্ষিক বইমেলা আয়োজিত হয়ে আসছে, বাংলাদেশ থেকে অনেক প্রকাশক অংশগ্রহণ করেন। তখন দেশ থেকে খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকরাও আসেন। বইমেলাকে কেন্দ্র করে প্রবাসী সাহিত্যপ্রেমীরাও সমবেত হন। কমিউনিটি সংবাদপত্রগুলোতে সাহিত্য পাতায় প্রবাসী কবি-লেখকদের লেখা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এসব অনুষ্ঠান ও সাহিত্যচর্চা ব্যাপকভাবে সেইসব বাংলাদেশির মধ্যে সীমাবদ্ধ, যারা দেশে থাকতেও কমবেশি সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ক্রমেই দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে। কিছু প্রবাসী পরিবারে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলাচর্চা শুধু কথা বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যাদের অধিকাংশই বাংলা পড়তে বা লিখতে পারে না। অনেক বাংলাদেশি পরিবারে আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের বাংলা উচ্চারণ 'নবাব সিরাজুদ্দৌলাহ' নাটকে 'লর্ড ক্লাইভ' অথবা 'ওয়াটসন'-এর মুখে বাংলা ডায়ালগের মতো: "হামরা বানিছ করিতে আসিয়াছে, হামরা বানিছ করিবে না কি নবাব কা ওয়াস্তে ঘোড়া কা ঘাস কাটিবে!" অথবা "এখানে টোমরা কী করিটেসে?" ইত্যাদি। বাংলা ভাষা 'মোদের গরব মোদের আশা' হলেও নতুন প্রজন্মের কাছে অদ্ভুত

এক ভাষা। তাদের কাছে বাংলা বর্ণবাদী ভাষা, কারণ এই ভাষায় মানুষকে তাদের সামাজিক অবস্থান অনুসারে মর্যাদা দেওয়া হয়, 'আপনি, তুমি, তুই,' বলে সম্বোধনের মাধ্যমে। উপমহাদেশের সব ভাষায় এই বর্ণবাদের উপস্থিতি বিদ্যমান। এসব সম্বোধনের মধ্যে ভালোবাসাসুলভ ব্যবহার যে নেই তা নয়, তবে বর্ণবাদী ব্যবহারই সর্বব্যাপী।

১৮৮০ সালে ব্রিটিশ সরকার ভাষার প্রশ্নে বিহার প্রদেশের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য স্কুলে দেবনাগরী হিন্দি চালু করার বিশেষ আদেশ দিয়েছিল। বাংলাভাষী মুসলমানরা তখন বাংলার পরিবর্তে ফারসিকে প্রাধান্য দিয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও বিশেষ করে সুবে বাংলায় বিপদে পড়েছিল মোগল আমলের দেওয়ানি ও কর সম্পৃক্ত সবকিছু ছিল ফারসিতে। তারা কর আদায় ব্যাহত করতে ফারসি পরিবর্তন করেনি। তা না হলে বাংলা উপমহাদেশের শীর্ষ ভাষায় পরিণত হতে পারত। সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। তা হয়নি সম্ভবত বাংলা ভাষায় সমন্বয়ের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে।

উপমহাদেশের ভাষাগুলোসহ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিশ্বের সকল ভাষায় লিঙ্গ আছে, রহস্যজনক কারণে বাংলা ভাষার কোনো লিঙ্গ নেই। ইংরেজিতে 'হি,' 'হিম' বললে পুরুষ, 'শি' ও 'হার' বললে নারী বোঝায়। বাংলা ভাষায় এটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ইউরোপ ও আমেরিকান ভাষাগুলোই শুধু নয়, উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষাগুলোতেও শুধু যে মানুষ ও প্রাণীর লিঙ্গ আছে তা নয়, জড়বস্তুরও পুং লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ আছে।

দিল্লিতে থাকাকালে বাসে যাতায়াত করতাম, প্রথম দিকে সব বাস রুট জানা ছিল না। বাস স্টপেজে কোনো বাস থামলে বাসের জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রীর কাছে জানতে চাইতাম, 'ইয়ে বাস কাহা জায়েগা?' যাত্রী আমার হিন্দি সংশোধন করে দিত: 'জায়েগা নেহি, জায়েগি।' অর্থাৎ বাসটি স্ত্রীলিঙ্গ। যে শিখ ভদ্রলোকের বাড়িতে ভাড়া থাকতাম, তাদের দুই কন্যা কোথাও যাচ্ছে দেখে যদি জানতে চাইতাম, 'কাহা জা রাহা হ্যায়,' তারা শুধুরে দিত, 'কাহা জা রাহি হ্যায়।'

এসব নিয়ে নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকান, আমার এক বাল্যবন্ধু, বহু বছর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। তার সন্তানেরা আমাকে তাদের পিতার 'বেস্ট ফ্রেন্ড' বলে জানে। আমার সঙ্গে সাক্ষাতে উচ্ছ্বসিত হয়, তারা আমার কাছে তাদের বাপের কৈশোর, যৌবন সম্পর্কে জানতে চায়; কোনো মেয়ের সঙ্গে তার প্রেম ছিল কিনা জানতে চায়। আমার সঙ্গে ওরা ইংরেজি টানে বাংলায় কথা বলে। তাদের পিতা আমাকে বলেন যে ওরা আমার সঙ্গে কথা বললেও ওদের মধ্যে দ্বিধা কাজ করে যে আমাকে 'তুমি' না 'আপনি' বলবে। কোনটা আমার ক্ষেত্রে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট! আমি ওদের আশ্বস্ত করি, কোনোটাতেই আমি কিছু মনে করব না। এরপরও ওরা আপনি তুমিতে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। আরও বিপদ আছে, বাংলাভাষীরা সবকিছু খায়: ভাত খায়, পানিও খায়। কোনোকিছু পান করে না: মদ-বিড়ি-গাঁজা সবকিছু খায়। যেসব সমাজে সকল তরল বস্তু এবং আগুন জ্বালিয়ে টানলে ধোঁয়া নির্গত হওয়ার বস্তু পান করা হয়, তারা বাঙালিদের পানি ও বিড়ি সিগারেট খাওয়ার কথা শুনে হাঁ করে থাকে। একটি জাতি শুধু খেয়ে এবং কোনোকিছু পান না করে কীভাবে টিকে থাকে?

প্রবাসে বাংলাচর্চা নবাগত বাঙালিদের মধ্যে সীমিত আকারে সীমিত থাকবে। কারণ বাংলা ভাষায় কথা জনসংখ্যার বিচারে তা উল্লেখযোগ্য হলেও বিশ্বে বাংলা ইংরেজির মতো প্রভাবশালী ভাষা হয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের নেতারা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এসে বাংলায় বক্তৃতা দেন এবং এটিকে জাতির অর্জন ও ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে দাবি করা হয়। কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অনেক দেশের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান জাতিসংঘে নিজেদের জাতীয় ভাষায় বক্তৃতা দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, জাতির জন্য অহংকার বলেও মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে কোনো দেশ যদি চায় যে তাদের প্রতিনিধি জাতীয় ভাষায় বক্তৃতা করবেন, তাহলে তাদের নিজেদের দোভাষী নিয়োগ করতে হয় অথবা জাতিসংঘের ছয়টি অফিসিয়াল ভাষা আরবি, চাইনিজ, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, রুশ ও স্পেনিশ ভাষার মধ্যে কোনো একটি অফিসিয়াল ভাষায় বক্তৃতার অনুবাদ সরবরাহ করতে হয়। বলা যায়, এটি একটি রুটিন প্রক্রিয়া।

একটি ভাষা তখনই মানুষকে আকৃষ্ট করে যখন তারা একই সঙ্গে সেই ভাষার সৌন্দর্য ও উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারে। আমাদের অংশের পৃথিবী থেকে মানুষ আমেরিকায় আসে মুখ্যত অর্থ উপার্জন করতে; দ্বিতীয়ত, নিরাপদে বসবাস করতে এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়তে। পাশ্চাত্যের যেকোনো দেশের মতো যুক্তরাষ্ট্রেও অর্থ উপার্জনে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কারও ফুরসত মেলে না। অনেকে ঠিকমতো ঘুমানোর সময় পর্যন্ত পায় না। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। অন্যকিছু করার সুযোগ কোথায়? ভাষাই বা শিখবে কখন? শিল্প-সাহিত্যের মতো সৃজনশীল কাজে অর্থ নেই। আমেরিকার মতো দেশে 'অর্থই সকল সুখের মূল।' তাই অর্থ ছাড়া কেউ কিছু বোঝে না। পিতা তাঁর সন্তানকে কোনো কাজের দায়িত্ব দিলে সন্তান ঘণ্টা হিসাব করে। এমন পরিবেশ মানুষের সুকুমারবৃত্তিগুলো প্রকাশের অনুকূল নয়। যারা লেখার মানুষ, তারা যেখানেই থাকবেন তাদের আবেগ অনুভূতি প্রকাশের জন্য লিখে যাবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমেরিকায় বসে খুব কম সংখ্যক লেখকের পক্ষে বাংলাদেশের খ্যাতিমান লেখকদের মানে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীকালে আরও কম হবে। কারণ নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকানদের মধ্যে যদি দু'চার জন্য সাহিত্যের জগতে বিচরণ করতে আসেন, তারা বাংলাসাহিত্য নিয়ে কতটুকু মাথা ঘামাবেন তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

কবিতার উপায় ও উপকরণ

অধ্যাপক ড. দিলারা হাফিজ

হাজার হাজার বছর কেটে গেল, তবু যার মীমাংসা এলো না, তাহলো কবিতা-শিল্প। কবিতার জন্ম মুহূর্ত থেকে স্বয়ং কবি, দার্শনিক, সমালোচক, সাহিত্যের শাস্ত্রকারদের একটিই প্রশ্ন, কবিতা আসলে কী? কবি, কীভাবে সৃষ্টি করেন তাঁর কাব্য-শিল্পের মায়া-হরিণ।

শতভাগ, মীমাংসাহীন এই প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা আলো প্রথম জ্বালিয়েছিলেন আচার্য ভরত, তাঁর বিখ্যাত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে। অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসে এ যাবৎ প্রাপ্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ হচ্ছে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' নামের এই গ্রন্থটি। ভাবা যায়! গ্রন্থটি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যবর্তী কোনো একসময়ে রচিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ভাবুন তো, সে কত কত সময়ের স্রোত পেরিয়ে গেছে মানবসভ্যতার বাতাবরণে। আচার্য ভরত ছিলেন মুখ্যত নাট্যশাস্ত্রকার, তাই তাঁর আলোচনার মূল বিষয় ছিল নাটক ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়। তবে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বাক্য, বাক্যবিন্যাস, বাক্যের দোষ, গুণ, অলঙ্কার, লক্ষণ ইত্যাদি এবং শৃঙ্গারাদি আট প্রকার রসের আলোচনাও করেছিলেন সেই গ্রন্থটিতে । আলোচনা, সমালোচনার প্রথম যাত্রাটি শুরু হয়েছিল ঐ আকর গ্রন্থের আলো নিয়ে।

ভরতের পরে দন্ডী তাঁর গ্রন্থে কাব্যের গুণ, ধর্ম ও প্রকারভেদের পাশাপাশি ছত্রিশটি অর্থালঙ্কারও উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন। দণ্ডীর মতে, অলঙ্কারই হচ্ছে কাব্যের সৌন্দর্য-বিধায়ক ধর্ম।

দণ্ডীর পরে আচার্য বামন (৮০০-এর কাছাকাছি) তাঁর কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি গ্রন্থে 'উপমাকেই' কবিতার প্রধান অলঙ্কার হিসেবে মেনে নিয়ে প্রসঙ্গত অন্যান্য অলঙ্কারের আলোচনা করেছিলেন।

এ-তো গেল শাস্ত্রকারদের কথা। যারা কবিতার সৃষ্টিকর্তা তাঁরা কী ভাবেন কবিতা নিয়ে, কিংবা কী চোখে দেখেন এই অধরা শিল্পকে, কবিতাকে—সেটি একটু জেনে নিলে তবেই আশা করি, বায়বীয় এই আলোচনা মাটির তল খুঁজে পাবে সামান্য হলেও একসময় বলা হতো, মানুষ তার মনের ভেতরের যেকোনো ভাব, চিন্তা-ভাবনা, আবেগ ও অনুভূতিগুলো যখন ছন্দোবদ্ধ আকারে প্রকাশ করে, তখনই সেটা হয়ে ওঠে কবিতা। বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক কবি ও দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, 'কবিতা দর্শনের চেয়ে বেশি, ইতিহাসের চেয়ে বড়।'

এবার না হয়, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যের দিকপাল কবিদের মুখ থেকে জানি, অসামান্য কিছু কথা।

কবি রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন, 'কবিতা হলো 'পারফরমেন্স ইন ওয়ার্ডস'।

কবি এডগার এলান বলেছেন, 'কবিতা হলো সৌন্দর্যের ছন্দময় সৃষ্টি।'

কবি এলিয়ট বলেছেন, 'কবিতা রচনা হলো রক্তকে কালিতে রূপান্তর করার যন্ত্রণা।'

একজন ইংরেজ কবি বলেছিলেন, 'মহাবিশ্বে কবিতার মৃত্যু নেই'।

বাংলা ভাষার কবি সৈয়দ শামসুল হকের মতে, 'কবিতা হচ্ছে সর্বোত্তম ভাবের সর্বোত্তম শব্দের সর্বোত্তম প্রকাশ। সর্বোত্তম ভাবের সঙ্গে সর্বোত্তম শব্দের সংযোগই পারে সর্বোত্তম কবিতা সৃষ্টি করতে। আমি মনে করি, নানা মাত্রায় কবিতাকে সংজ্ঞাবদ্ধ না করে বরং এক কথায় বলা যায়, 'কবিতা ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গীত।'

শুদ্ধ শিল্প হিসেবে পৃথিবীতে কবিতার আগমনও প্রথমে। সাহিত্যের সেই শুদ্ধতম অশ্রুপাত, যা মানব অন্তরকে অলৌকিক আনন্দ আস্বাদনে দলিত, মথিত, স্পন্দিত করে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখের পক্ষে যা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক কবি তার কবিতার মধ্যে অলৌকিক এক মায়ার জগত সৃষ্টি করেন। যা পাঠককে সম্মোহনের মতো ধরে রাখে এবং পাঠে বাধ্য করে।

এ কথা আমার নয়, কাব্য-জিজ্ঞাসু অলঙ্কার শাস্ত্রকারদের। হাজার হাজার বছর আগেই তারা কবিতার জগতকে এভাবে মহিমান্বিত করে গেছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন কেন এবং কীভাবে তা সম্পাদন করেন একজন কবি।

কবিতার শরীরে ও আত্মায় লাবণ্যে জুড়ে দিয়ে কবি সৃষ্টি করেন, অনাস্বাদিতপূর্ব এক মরমী চৈতন্যের রস-ব্যঞ্জনা।

সৃষ্টিশীল কাব্য-কৌশলের সেই তন্ময় মুহূর্তে কবিতায় যুক্ত হতে থাকে এক এক করে তার প্রধান উপাদানসমূহ। কবিচিত্তের অনায়াস লব্ধজ্ঞান, কল্পনা ও ভাবাবেগ থেকেই তা উৎসারিত হয়ে থাকে। এজন্যে ভালো কবিতা রচনার জন্যে কবির পঠন পাঠনও জরুরি বলে মনে করেন সমালোচকবৃন্দ। কবিতার পাঠকদেরকেও বলেছেন' সহৃদয়হৃদয়সংবাদী' হতে। কবিতা সৃষ্টিতে কী কী প্রয়োজন? প্রধানত চারটি উপাদান হলেই একটি সার্থক কবিতা রচনা সম্ভব।

১। ভাব। ২। ভাষা। ৩। ছন্দ। ৪। অলঙ্কার।

১। ভাব :

প্রথমেই ভাবের কথা আসে এই জন্যে যে, মনে ভাব না এলে একজন সৃষ্টিশীল মানুষ, যিনি কবি, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কবিতা লিখবে কেন? ভাব বা বিষয়বস্তু বলতে কবির মনের ভাব বোঝালেও প্রাচীন আলঙ্কারিক শাস্ত্র অনুযায়ী কবিতারভাব বা বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিল সেই যুগে।

মানুষের মন তো একটা অন্ধকার জঙ্গল। শিক্ষার আলো দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, সেটুকু ছাড়া বাকিটুকু তো অন্ধকার। সেখানে ঠাঁই অঠাঁই কত ভাবের উদয় হয়? সবই কি কবিতা লেখার বিষয়? নিশ্চয় নয়। প্রধানত, প্রেমবোধ, আদর্শ কিংবা ধর্মীয় আদর্শকে বিষয়বস্তু করে কবিতা লেখা হতো প্রাচীন ও মধ্যযুগে। জাতীয় জীবনের বীরত্বপূর্ণ কোনো কাহিনি বা আদর্শ বীরের জয়গাথা কিংবা কোনো আদর্শের কথা প্রচারের জন্যে কবিতা রচনা করাই ছিল রীতি। কাজেই আমরা লক্ষ করি, বাংলাসাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্য প্রধানত দেবতাদের মাহাত্ম্য ও গুণকীর্তন করেই রচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে মধ্যযুগের শেষে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলে পরিচিত ও বিখ্যাত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্তই প্রথম তুচ্ছ যেকোনো বিষয়কে কবিতার বিষয় করে তুলেছিলেন।

উদাহরণত, তাঁর 'তপসে মাছ' পাঁঠা, রসময় রসের ছাগল ও আনারস, এমনকি নারী শিক্ষা নিয়েও তিনি অনেক সার্থক রঙ্গব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছেন। এই সমসূত্রে কবিতার ভাব বা বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট অর্গলটিও তিনি ভেঙে দিয়েছেন।

আধুনিক সময়ে যেকোনো বিষয়, কবিতার বিষয় হতে পারে, কবি যদি তা যথোচিতভাবে ফুটিয়ে তুলে বিষয়টিকে কবিতা করে তুলতে পারেন। তবেই তা সার্থক।

কবির জীবনবোধ ও কবিতার বিষয় হতে পারে, যেমন—

'না থেকেও, থাকে যে, বাতাসে প্রীতি
সে বড় অসহ আত্মরতি!
স্মৃতির খননে বাড়ে নিজেরই ক্ষতি,
নতুনের কাছে পুরোনো যেন চিহ্নহীন যতি'।

কবিতায় এখনো প্রেমবোধ একটি আকর্ষণীয় ভাব বা বিষয়। শতলক্ষকোটি কবিতা রচনা হয়েছে প্রেমনিয়ে।যুগে যুগে তার প্যাটার্নবদলেছে, কিন্তু কবির ব্যক্তি অনুভূতির ছায়াপাতে প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে নানা মাত্রিকতায়। যেমন রফিক আজাদের প্রেমের কবিতা হিসেবে 'প্রতীক্ষা' 'ভালোবাসার সংজ্ঞা,' তুমি : বিশ বছর আগে ও পরে' তুমুল জনপ্রিয় কবিতা। কবির ভক্ত পাঠক ও আবৃত্তিকারদের মুখে মুখে ফিরছে তা আজো।

'ভালোবাসা মানে দু'জনের পাগলামি,
পরস্পরকে হৃদয়ের কাছে টানা;
ভালোবাসা মানে জীবনের ঝুঁকি নেয়া,
বিরহ-বালুতে খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি;'

মধ্যযুগের চতুর্দশ শতকের বাঙালি কবি বড়ু চণ্ডীদাস যখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের আখ্যানে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের আকূতিকে শব্দরূপ দেন, একইভাবে আমাদের হৃদয়কে তা আলোড়িত করে।

'কে না বাঁশি বায়ে বড়ায়ি কালিনী নই কূলে
কে না বাঁশি বায়ে বড়াই এ গোঠ গোকুলে

আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন
বাঁশির শব্দে মোঁ আইলাইলো রান্ধন'।

পরিশেষে, একথা বলতে চাই যে, কোনো বিষয় আজ কবিতার বিষয়। যেকোনো বিষয় বা ভাব নিয়ে কবিরা কবিতা লিখতেপারেন আজ অনায়াসে। তবে শর্ত একটাই তা যেন কবিতা হয়ে ওঠে!

২। ভাষা :
ভাষা কী? ভাষা মানুষের সংযোগ সেতু। মন থেকে মনে ভাব বিনিময়ের প্রধান বাহন এই মাতৃভাষা বাংলা। এই মায়েরভাষায় কথা বলার অধিকার ছিনিয়ে আনতে গিয়ে আমাদের সূর্যসন্তানরা রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলেছেন। সৃষ্টি হয়েছে বাঙালির বীজমন্ত্র বায়ান্নর ভাষা
আন্দোলন, সেই শক্তি নিয়ে গর্জে উঠেছে মহান একাত্তর। আমরা পেয়েছি স্বাধীন রাস্ট্র ও লাল-সবুজ পতাকা। কাজেই বাংলা ভাষা আমাদের দ্বিতীয় ঈশ্বর।
শস্যদানার মতো কবিতার প্রধান উপাদান ভাষা। অবশ্যই মাতৃভাষা কবিতা রচনার উত্তম মাধ্যম। বিশেষভাবে পলি-কাদার সহজ, স্বাদু মিষ্টি ও কাব্যিক ভাষা হিসেবে বাংলা চিরকালই

বিশেষ স্থান দখল করে আছে। উপরন্তু বাংলার নিজস্ব শব্দ ছাড়াও ভূ-রাজনীতির কারণে আরবি- ফারসি-ইংরেজি, চাইনিজ-পুর্তগিজ, সংস্কৃতসহ বিভিন্ন ভাষা থেকে অভিবাসিত শব্দাবলি নিয়ে বাংলাভাষার শব্দ-ভাণ্ডার আজ পরিপূর্ণ, অফুরন্ত। কথায় আছে যেকোনো ভাষায় 'শব্দই ব্রহ্ম'।
অভিধানে শব্দ পড়ে থাকে মৃত মাছির মতো। একজন কবিই তার ব্যবহার গুণে শব্দে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। একমাত্র কবির হাতেই শব্দের সর্বোত্তম ব্যবহার হয়ে থাকে।
কীভাবে?
এর উত্তরে একটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট।
মনে করুন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 'খোঁড়াখুঁড়ি' শব্দটির কথা। সাধারণত এই কেজো শব্দটি ব্যবহার করি, মাটি ও কবরখোঁড়া প্রসঙ্গে। কিন্তু কবি জীবনানন্দ দাশ যখন দীর্ঘ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সাজিয়ে তাঁর 'হায় চিল' কবিতায় বলেন,
'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে
গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে'!
তখন এই খুঁড়ে শব্দটি হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে তার দৈনন্দিনতা এবং দীনতা পরিহার করে ভিন্ন এক অলৌকিক রস-ব্যঞ্জনায় বেজে ওঠে। শব্দটির মহিমা বেড়ে যায় হাজার গুণ। পাঠকের শ্রুতিতেও নতুন হাওয়া বয়ে যায়। হৃদয় নেচে ওঠে বিদ্যুৎ লতার মতো। তাই নয় কি?
যে কবি প্রতিটি শব্দের বুক থেকে তার গানকে এভাবেই মুক্ত করে দিয়ে তাতে নতুনতর প্রাণ
প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তিনি পাঠকহৃদয়ে বেঁচে থাকেন।

৩। ছন্দ :
ছন্দ কী এবং কেন, তা বলবার আগে একটু ভূমিকা দরকার অবশ্যই। যেহেতু বর্তমান সময়ে, বিশেষভাবে ফেসবুক যখন কবিতাচর্চার কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে, সম্পাদক ও সম্পাদনাহীন কবিতা পাঠ করছি প্রতিদিন। সেখানে প্রধানত, নবীন কবিদের কবিতায় ছন্দর সবিশেষ পরিচয় খুব কমই খুঁজে পাই। ছন্দ ছাড়াই যেহেতু কবিতা লেখা যায়, কাজেই কবিতার ব্যাপক জন্ম-বিস্ফোরণ লক্ষ করছে আমার মতো অনেকেই।
কবিতায় ছন্দের ব্যবহার অনেকটা সৌখিনতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে অতীতের মতো ছন্দ বাধ্যতামূলক নয় বলে, অকবিতার বৃদ্ধিও ততোধিক বলেই মনে করি।

কাজেই একথা বলা যায় যে, একবিংশ শতাব্দীতে কবিতা ও ছন্দের সম্পর্ক নিঃসন্দেহে অতীতের মতো নেই। প্রাচীনযুগ মধ্যযুগ হয়ে রবীন্দ্রনাথের কাল পর্যন্ত কবিরা ছন্দহীন কবিতা রচনার কথা ভাবতেও পারেননি একটা পর্যায় পর্যন্ত। কবিতার শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে আধার ও আধেয়ের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেখা যায় কবিদের কেউ কেউ তাদের কবিতায় ভাব-রস ব্যঞ্জনার চেয়ে আঙ্গিকের প্রতি যত্নবান বেশি। অর্থাৎ ভাষা ও ছন্দের দিকে মনোযোগ অধিক। এই প্রসঙ্গে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা বলা যায়, সমালোচকেরা যাকে কবির চেয়ে ছান্দসিক হিসেবে অধিক বিখাত মনে করেন। এ রকম কবির সংখ্যা অতীতে অনেক ছিল। গোল বাধল তিরিশের দশকের পঞ্চপাণ্ডব বলে খ্যাত কবিবৃন্দ নিয়ে।

এদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ মাত্র ৫৫ বছর বেঁচেছিলেন অপর দিকে পাঁচজনের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তীপ্রায় ৮৭ বছরের দীর্ঘজীবী কবি। এই পাঁচজন কবিই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং পরবর্তী সময়ে অধ্যাপনা করেছেন। পত্রিকা সম্পাদনায় সিদ্ধহস্ত। কবিতার ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা পত্রিকা' এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা একটি মাইল ফলক। ধারাবাহিকভাবে পাঁচজন কবির জন্ম ও মৃত্যুর সময়কাল মনে রাখলে তাদের বুঝতে সহজ হবে।

১। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯—১৯৫৫)
২। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১—১৯৬০)
৩। অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১—১৯৮৭)
৪। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪)
৫। বিষ্ণু দে (১৯০৯—১৯৮২)

কবি বুদ্ধদেব বসু একবার বলেছিলেন, 'বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস কবিতার দ্বারা গদ্যরাজ্য জয়ের ইতিহাস'। কবিতার এই পঞ্চপাণ্ডব সম্পর্কে আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর এক নিবন্ধে বলেছিলেন, 'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী, ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত কবিতাকে এরা আধুনিক কবিতা হিসেবে দেখেছিলেন।'

কথা সত্য। এই পঞ্চের বিদ্রোহটি শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রবলয় ভেঙে বেরিয়ে এসে আলাদা ধরনের নতুন কবিতা রচনার তাগিদ থেকে। ইংরেজি সাহিত্য পঠন-পাঠনের ফলে ইতোমধ্যে তাঁরা জেনে গেছেন যে, ১৮৮০ সালে ইউরোপীয় সাহিত্যে গড়ে ওঠা ডাডাবাদ, স্যুররিয়ালিজমসহ কবিতাকেন্দ্রিক বিভিন্ন আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে। সর্বোপরি ইউরেপীয় সাহিত্যে তখন শার্ল বোদলেয়ার এবং মালার্মের আবির্ভাব কালকে আধুনিকতার সূচনাকাল হিসেবে ইতোমধ্যে গণনা করতে শুরু করেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য বোদ্ধারা।

এই সূত্রেই বাংলা ভাষার কবিরাও প্রথমে ছন্দের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে বক্তব্যকে ঢালাওভাবে ছড়িয় দিলেন গদ্য ছন্দে। ভাবের প্রশ্নে, রাবীন্দ্রিক প্রেমের প্লেটোনিক সূত্রকে অগ্রাহ্য করে পুরাতন প্রেমের মন-অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সেখানে রক্ত-মাংসের দেহজ-কামনা-বাসনা সংবলিত প্রেমিকার জয় ঘোষণা করলেন। সেই প্রেমকে আবাহন করে গোবিন্দ চন্দ্র দাস প্রথম কবিতায় ঘোষণা দিলেন,

'আমি তাকে ভালোবাসি অস্থি-মজ্জাসহ'।

পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অর্কেস্ট্রা কাব্যের 'শাশ্বতী' নামক কবিতায় বললেন নতুন কথা। কবিতাটির বক্তব্যে নতুনত্ব এনেছেন, তাই বলে ছন্দ কিন্তু তিনি এখানে পরিহার করেননি। ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এ কবিতাটি প্রেমের উৎকৃষ্ট কবিতার উদাহরণ। এক বাদল শেষের রাতে কবির দয়িতা এসেছেন তার কাছে, সহসা তার হাতে হাত রেখে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে বলেছেন, 'ভালোবাসি'। মুহূর্তেই যেন সরণিজুড়ে মাধুরি-মদিরায় দেহ ও মন তাদের এক ঘোর অমৃতলোকে জেগে ওঠে। হাতের সামান্য ছোঁয়া আর দয়িতার মুখ-নিঃসৃত একটি মাত্র ৪ মাত্রার শব্দ 'ভালোবাসি' মহাকালের চিরচঞ্চল গতিকে থামিয়ে স্থির করে দিয়েছিল সেদিনের সেই মুহূর্তে, এখানেই প্রেমের কবিতার সার্থকতা।

'একদা এমন বাদল শেষের রাতে
মনে হয় যেন শত জনমের আগে
সে এসে সহসা, হাত রেখেছিলো হাতে
চেয়েছিলো মুখে সহজিয়া অনুরাগে
অনাদি যুগের যত চাওয়া যত পাওয়া
খুঁজেছিলো তার আনত দিঠির মানে...
একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে
ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।

তবে, এই তিরিশের দশক থেকে গদ্যছন্দের কবিতায় সাড়া দেন কবিরাও। প্রত্যেক যুগেই কবিকে পুরোনো ঐতিহ্য পেছনে ফেলে সন্ধান করতে হয় আধুনিকতার। সেই আধুনিকতা কবিতায় দেখা দেয় দুভাবে কবিতার ভাব বা বিষয়বস্তুতে এবং আঙ্গিকে অর্থাৎ ভাষায় ও ছন্দে।
সবাই জানি, ছন্দ ভাষার অন্যতম প্রাণশক্তি। প্রকৃতিতে ছন্দের অসংখ্য উদাহরণ আছে। বাতাসের দোলা, নদীর স্রোত,পাতার দুলুনি, ইত্যাদি।

ছন্দ মূলত বাণী বিন্যাস কৌশল। মানুষ যখন কথা বলে, তখন স্বাভাবিকভাবে এক ধরনের ছন্দ সে ব্যবহার করে। ছন্দ অর্থ ছাঁচ, গড়ন বা ভঙ্গি। উপযুক্ত ছন্দ কবিতাকে অর্থের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি দানে সহায়তা করে।

বিষয়ভেদে কবিতাতে নানা রকম ছন্দ প্রযুক্ত হয়। ভাবকে কথার অপূর্ব লীলা দিয়ে মূর্ত করে তোলা হয় কবিতায়, সেক্ষেত্রে ছন্দকাজ করে অন্তঃসলিলা স্রোতের মতো।
ছন্দ কবিতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। প্রধানত, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্তও অক্ষরবৃত্ত— এই তিন প্রকার ছন্দের কথাই বলতে চাই আমি। নানা প্রকার ছন্দ আছে, বিশেষভাবে পাঠে আগ্রহীরা তা পড়ে জেনে নেবেন। প্রাথমিকভাবে একজন নবীন কবিকে এটুকু জানলেই চলবে, তিনি যদি ছন্দে কবিতা নাও লিখতে চান তবু ছন্দ জানা থাকলে গদ্য ছন্দেও তিনি কবিতার সৌন্দর্য বিন্যাস অনিবার্য করে তুলতে পারবেন অনায়াসে।

বাংলা ভাষার প্রাচীন ছন্দ হিসেবে পয়ার বা অক্ষরবৃত্তের নাম সকলেরই জানা। এই ছন্দ তো একদিনে সৃষ্টি হয়নি, তার পেছনে মজার ইতিহাস আছে।

বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির আগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে প্রাচ্য সাহিত্যের অন্যতম প্রধান দুটি মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত। এ ছাড়াও ভবভূতি, ভর্তৃহরি এবং কালিদাসের মতো বিখ্যাত সংস্কৃত ভাষার কবির মূল্যবান রচনা আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। কালিদাসের বিখ্যাত 'মেঘদূত কাব্য' সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় চমৎকার অনুবাদ করেছেন তিরিশের কবি বুদ্ধদেব বসু। রামায়ণ, মহাভারত মধ্যযুগেই বাংলায় অনূদিত হয়েছে মাত্র।

কথিত আছে যে, আদি কবি বাল্মীকি, সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রচিত দুই পঙ্‌ক্তির শ্লোক হলো প্রথম কবিতা।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমঃ অগমঃ শাশ্বতী সমাঃ
যত্ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদ একম্ অবধী কামমোহিতম"।

বাংলায় যার অর্থ, হে নিষাদ তুমি মিলনরত ক্রৌঞ্চ পাখির একটিকে বধ করেছো, কাজেই জগতে তুমি প্রতিষ্ঠা পাবে না। ক্রৌঞ্চবধের শোক থেকে উচ্চারণ করেছিলেন বলেই বাল্মীকি তার নাম দিয়েছিলেন শ্লোক। এই বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেছিলেন অনুষ্টুপ ছন্দে। বলা হয়ে থাকে যে, এই অনুষ্টুপ ছন্দই বাংলা ছন্দের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

বাংলা কাব্য ইতিহাসের দীর্ঘ অবলোকনে এ কথা বলা সঙ্গত যে, বাংলাভাষার কবিদের আবেগ সমৃদ্ধমৌলিক সৃষ্টিধর্মী চিন্তা ও কৌশল সব চেয়ে বেশি কাজ করেছে বাংলা ছন্দের ইতিহাস বিনির্মাণে। এজন্যে বাংলা ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন ছন্দ হিসেবে 'পয়ার' এর স্বীকৃতি সর্বজনবিদিত।

পয়ার বলতে সাধারণ আট-ছয় পর্বের চৌদ্দ অক্ষরের পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট কবিতার ছন্দকে নির্দেশ করে।
মধ্যযুগের পয়ারের উদাহরণ:

মহাভারতের কথা/ অমৃত সমান।—৮+৬=১৪
কাশীরাম দাশ ভণে/ শুনে পুন্যবান॥—৮+৬=১৪

লক্ষণীয় যে, পয়ারের প্রত্যেক চরণ শেষে এক দাড়ি, দ্বিতীয় চরণে দুই দাড়ি। প্রত্যেক চরণেই আলাদা আলাদা বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। যে কারণে বক্তব্যের মধ্যে কোনো প্রবহমানতা নেই। পয়ার অক্ষরবৃত্তের একটি শাখা।

পয়ার ছাড়াও অক্ষরবৃত্তের আরও শাখাসমূহ নানা নামে পরিচিত । আমি কিছু নাম উল্লেখ করেছি শুধু ছন্দের বৈচিত্র্য বোঝাতে।

যেমন-তরুল পয়ার, মালঝাঁপ পয়ার, মালতি, বিশাখ পয়ার, কুসুম মালিকা, মহাপয়ার, সমিল মহাপয়ার, অমিল মহাপয়ার, পর্যায়সম, মহাপয়ার, মধ্যাসম মহাপয়ার, একাবলী, দীর্ঘ একাবলী, মিশ্রছন্দ, ত্রিপদী ছন্দ, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, অসমপর্বিক, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, লঘু চৌপদী, দীর্ঘ চৌপদী ও অমিত্রাক্ষর।

সর্বশেষ অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর আধুনিক 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্য বাংলা ভাষায় রচনা করেন। পয়ারে যেমন প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি শেষে অন্ত্যমিল ছিল, তিনি তা পরিহার করেছেন, এবং প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি শেষে এক ও দুই দাড়ি তুলে দিয়েছেন।

বক্তব্যের প্রবহমানতা সৃষ্টির জন্যে দাঁড়ি ছাড়াও অন্যান্য বিরতি চিহ্নের ব্যবহার করেছেন প্রয়োজন অনুসারে। ছন্দটিকে মহাকাব্যের বীররস তথা বক্তব্যের গুরুভার বহনের যোগ্য করে তুলেছেন তিনিই প্রথম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামায়ণের কাহিনির নবরূপ দিয়ে তিনি নয় সর্গে মহাকাব্যটি শেষ করেছেন। প্রথম সর্গের নাম, 'অভিষেক'।

নায়ক রাবণের পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে কাব্যের শুরু হয়েছে এভাবে:

'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি?'

এখানে বক্তব্যের প্রবহমানতা গড়িয়ে গড়িয়ে পাঁচ চরণে এসে শেষ হয়েছে। এটাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের নতুনত্ব এবং পয়ার থেকে ভিন্ন হয়ে উঠেছে।

মাইকেল মধুসূদনের পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ছন্দের রূপ নির্মাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত—তিন প্রকার ছন্দেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। বিশেষভাবে মাত্রাবৃত্ত রচনায় স্বকীয়তা অভাবনীয়। মানসী কাব্যে মাত্রাবৃত্তের সফল প্রয়োগ লক্ষণীয়। নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতাটির শুরু এভাবে:

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে ৬+৬
হে সুন্দরী—৫
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার ৬+৬
সোনার তরী।৫

তেমনি ক্ষণিকা কাব্যে স্বরবৃত্তের মতো লঘু ছন্দে যে গুরুভার বক্তব্য প্রকাশ করা যায়, সেটিও
প্রমাণ করেছেন। চমকে দিয়েছেন পাঠককে।

নীলের কোলে/শ্যামল সে দ্বীপ/প্রবাল দিয়ে/ঘেরা ৪+৪+৪+২
শৈল চূড়ায়/নীড় বেঁধেছে/সাগর বিহঙ/গেরা ৪+৪+৪+২

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর স্বভাবগত কারণেই অক্ষরবৃত্তের তুলনায় স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অগ্নিবীণা কাব্যসহ অনেক গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দে নতুন এক ধরনের ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত তৈরির চেষ্টা করেছেন। তাঁর রচিত রণসংগীত লক্ষণীয়,

চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে ৬+৬
বাজে মাদল ৫
নিম্নে উতলা ধরণীর তল ৬+৬
চলরে চল। ৫

মম/ এক হাতে বাঁকা/ বাঁশের বাঁশরী ২+৬+৬
আর হাতে রণ/তূর্য ৬+৩
'মম' শব্দটি দুই মাত্রার অতি পর্ব যা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে চরণের প্রথমে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় চরণে ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব একটি এবং চরণ শেষে ৩ মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে।
অক্ষরবৃত্তের সর্বশেষ একটি ধারা গদ্যছন্দ।
গদ্যছন্দ (Prose Verse) : আধুনিক কালে কবিতায় গদ্যছন্দ ব্যবহার করা হয় বক্তব্যের প্রয়োজনে। অনেকের ধারণা আধুনিক কবিতায় কোনো ছন্দ নেই। তাদের ধারণা, ছন্দ মানে অন্তঃমিল। গদ্য ছন্দের ক্ষেত্রে গদ্যভাষার ছন্দ, সুষমাকে ব্যবহার করা হয়। যাকে বলা চলে ছন্দস্পন্দ। এই ছন্দ অস্ফুট।
গদ্য ছন্দে পদ্য ছন্দের মতো যতির দ্বারা চরণ বা পঙ্‌ক্তি পর্বে বিভক্তি হয় না। উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ কাব্যের ক্যামেলিয়া কবিতাটির কথা ধরা যাক।

'নাম তার কমলা।
দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা-
সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায়।
আমি ছিলেম পিছনের বেঞ্চিতে'।
(ক্যামেলিয়া)

প্রবহমান পয়ার:
যে কবিতায় অন্ত্যমিল ঠিক রেখে পঙ্‌ক্তিগুলোর প্রবহমানতা বিদ্যমান থাকে, তা প্রবহমান সমিল পয়ার!

উদাহরণঃ
"হে দারিদ্র্য তুমি মোরে/ করেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়েছ/ খ্রীস্টের সম্মান।
কণ্টক-মুকুট শোভ!/ দিয়াছ, তাপস
অসঙ্কোচ প্রকাশের/ দুরন্ত সাহস:
(দারিদ্র্য/কাজী নজরুল ইসলাম)

নদী যেমন তটের শাসন মেনে চলে, অন্যথায় প্লাবিত করে জনপদ, ঘরদোর অনেক কিছু। কবির আবেগও যদি ছন্দের শৃঙ্খলা বাসামান্য শাসন মেনে প্রবাহিত হয়, তবে তা সহজেই কবিতা হয়ে ওঠে। অন্যথায় অন্ধ আবেগের উদগীরণে তা হয়ে ওঠে ভাবোচ্ছ্বাস বা ভাবালু কথকতা।

৪। অলঙ্কার:
সংস্কৃত 'অলম' শব্দ থেকে অলঙ্কার শব্দটি এসেছে। যার অর্থ ভূষণ। নবম শতকের শেষদিকে কাব্য-জিজ্ঞাসার সমসূত্রে অলঙ্কার একটি বিশিষ্ট শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাংলা অলঙ্কার শাস্ত্র মূলত সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেরই যমজ।
নারীদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে মেয়েরা যেমন নানা অঙ্গে বিভিন্ন ডিজাইনের অলঙ্কার ধারণ করে।কাব্যদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যেও সৃষ্টি হয়েছে কাব্যালঙ্কার।
ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, যেগুণ দ্বারা ভাষার শক্তিবর্ধন ও সৌন্দর্য সম্পাদন হয়, তাকে অলঙ্কার বলে।
অলঙ্কার প্রধানত, দুই প্রকার।
১। শব্দালঙ্কার: শব্দালঙ্কারের লক্ষ কবিতায় ব্যবহৃত শব্দে ধ্বনিমাধুর্য ও শ্রুতিসুষমা সৃষ্টি করা। বিভিন্ন রকমের শব্দালঙ্কারের মধ্যে প্রধানত, অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, ধ্বনুক্তি ইত্যাদি।
অনুপ্রাসের একটি উদাহরণ:
'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নেশা'
'র' বর্ণটি পরপর চারবার উচ্চারিত হওয়ার ফলে যে ধ্বনিসুষমা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে, এ কারণে অনুপ্রাস অলঙ্কার সৃষ্টি হযেছেএখানে।
২।অর্থালঙ্কার: যে অলঙ্কার শব্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অর্থের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তাকে অর্থালঙ্কার বলে। অর্থালঙ্কারের যথোচিত প্রয়োগের ফলে বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে।
অর্থালঙ্কার পাঁচ প্রকার। যথা:
১. সাদৃশ্যমূলক
২. বিরোধমূলক
৩. শৃঙ্খলামূলক
৪. ন্যায়মূলক
৫. গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক।

এই পঞ্চমের অধীনে উল্লেখযোগ্য অলঙ্কারসমূহ যথাক্রমে, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সন্দেহ, বিরোধাভাস, ব্যাজস্তুতি অন্যতম।

উপমা: দুই বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে যখন তুলনা করা হয় তখন, উপমা অলঙ্কার সৃষ্টি হয়।
উদাহরণ:
'মেয়েটি লতার মতো দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে'
কিংবা: 'কচি কলপাতা সন্ধ্যা'।
এখানে লতা ও মেয়ে দুটি বিজাতীয় পদার্থ, কিন্তু দুজনের বেড়ে ওঠার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। এজন্যেএটি উপমা অলঙ্কারের উদাহরণ। একইভাবে কচি কলাপাতা এবং সন্ধ্যা দুটি বিজাতীয় পদার্থ কিন্তু সন্ধ্যা ও কচি কলাপাতার রঙের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে।
চিত্রকল্পের উদাহরণ:
'নদীর ওপারে বন ছুঁয়ে চাঁদ উঠে এলো
নটীর মতন নিটল চোখের নিচে কালি'।
এখানে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে একজন নৃত্যশিল্পীর বা নটিনীর বেদনাদীর্ণ জীবনধারাকে। কাজেই এখানে উপমা ছাড়াও সৃষ্টি হয়েছে একটি সার্থক চিত্রকল্প।
অনেক কাব্য সমালোচক বলেন, চিত্রকল্পই কবিতা। একটি সার্থক চিত্রকল্প রচনা করা সত্যি খুব দুরূহ কাজ, তবে তা মহত কাব্যশক্তির পরিচায়কও বটে।

নিউইয়র্কে বাঙালিদের সংগঠন ও সংবাদমাধ্যম

অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

বাঙালি বলতে নিবন্ধটিতে বাংলাদেশের বাঙালিদের বোঝানো হচ্ছে। এদের সঙ্গে নিত্য চলাফেরা সেই ১৯৯৪-৯৫ থেকে, যখন আমি স্বদেশ ছেড়ে এই ভিনদেশ যুক্তরাষ্ট্রে আসি। আড্ডা ও সংগঠনে যুক্ত হওয়ার চিরায়ত বাঙালি মন-মানসিকতা থেকে মুক্ত নই। তাই ১৯৯৬ থেকেই নিউইয়র্কের সংগঠন ও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যৎকিঞ্চিত জড়িত হয়ে পড়ি। দেশে থাকতেই পরিচয় ছিল এমন এক সুহৃদ আরও কয়েকজনকে নিয়ে বাসায় উপস্থিত হয়ে আমাকে বুঝিয়ে ফেলতে সমর্থ হন যে, সে সময় বিদ্যমান দুটো জেলা সংগঠনের মধ্যে তাদেরটিই সেরা । তাদের অর্জন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সময় নিয়ে খুলে বলেন। আমার এক সহপাঠী ফজলুল হক (শায়েস্তাগঞ্জ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল, অবসরপ্রাপ্ত ও বর্তমানে প্রয়াত) এতে উপদেষ্টা হিসেবে আছেন শুনে রাজি হয়ে যাই। আজতক ওই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত আছি। শুরুতে আমরা দুজন উপদেষ্টা ছিলাম; এখন জনা দশেক। কাজের পরিধি বেড়েছে, সাংগঠনিক রাজনীতিও বেড়েছে; সুতরাং প্রাক্তন সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক জাতীয় যারা তারা এবং দেশ থেকে আসা বিজ্ঞজনদের এ কাতারে আলিঙ্গন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। নিউইয়র্কে জেলাটির দুটি সংগঠনের স্থানে এখন চারটি বা ততোধিক সংগঠন হয়েছে। প্রতি থানা বা উপজেলারও এক বা একাধিক সংগঠন। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার ক্ষেত্রে প্রায় একই চিত্র। পার্শ্ববর্তী সুবৃহৎ দেশ ভারত বা শ্রীলঙ্কা, নেপাল এ-সব দেশের নিউইয়র্কে বসবাসকারীদের মধ্যে এমন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না।

আড্ডা'র প্রসঙ্গে ফিরে আসি। পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি। গিয়েই বাঙালি খুঁজেছি। মায়ের ভাষায় কথা বলার জন্য, আড্ডা দেওয়ার জন্য, বাঙালি খাবার খেতে পারব এমন একটা ব্যবস্থা বা সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য। আমার অভিজ্ঞতায় বাঙালি হিসেবে বিদেশে ও আমাদের প্রধান বিনোদন আড্ডা, তারপর বাঙালি কায়দায়, উপাদানে তৈরি করা খাবার/আহার। আড্ডা থেকে, ভূরিভোজন থেকে বাঙালির মাথায় সংগঠন সৃষ্টির বাসনা আসে। কয়েকজন বাঙালি একত্রিত হলেই এ কাজটি করে। আর আড্ডা তো বাঙালির সহজাত, জন্মগত একটি উদগ্র বাসনা। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী'র ভাষায়, "বাঙালি খুবই আড্ডা প্রিয়, এবং আড্ডাকে পারলে সে আদর্শায়িত করে। যুগ যুগ ধরে সে আড্ডা দিচ্ছে, গাছতলায় বসে, বারান্দায় পা ঝুলিয়ে, ড্রয়িং রুমে জমায়েত হয়ে। দেশে আড্ডা, বিদেশে আড্ডা"(দেখুন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'বাঙালির সংস্কৃতিতে ঐক্য এবং বিবর্তন', পড়শী, ২য় বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৪)। নিউইয়র্ক শহরে বৈধ, অবৈধ মিলিয়ে এখন প্রায় ৫ লক্ষ বাঙালি আছে। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে জ্যামাইকা হিলসসাইড এলাকায় মাত্র একটি গ্রোসারি ছিল। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে আসা সিরাজুল ইসলাম এমটিএ'র প্লানিং বিভাগে চাকরি করতেন। ছাঁটাই হয়ে গেলে পসারির দোকান শুরু করেন। বাংলাদেশ গ্রোসারি নাম ছিল। পরবর্তীকালে ফার্মাসিস্ট রশীদ এবং তার ভাইয়েরা কিনে নেন। এ পরিবারটি সাগর সুইটসসহ অনেকগুলো স্টোরের মালিক বনে যান অচিরেই। ফাতেমা স্টোর প্রায় একই সময়ে যাত্রা শুরু করে আজ বেশ কটি'র মালিক কুইন্স কাউন্টির বিভিন্ন এলাকায়। বাঙালি মালিকানায় হরেক রকম পণ্যসামগ্রীর দোকানে বর্তমানে এলাকাটি মানুষে সারাক্ষণই গমগম করে। এই বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় সংগঠন এখন বেশ কয়েকটি। সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ব্যবসা-বাণিজ্যভিত্তিক ইত্যাদি। হিলসাইডের দু'পাশে কয়েকশ গজের মধ্যে বেশ ক'টি মসজিদ। বিভেদ, দলাদলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও আছে। বাঙালি বিদেশে গিয়ে রাতারাতি সংগঠন বানাতে যেমন পারঙ্গম; তেমনি নেতৃত্ব নিয়ে, দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার নিরিখে, আদর্শের প্রশ্নে বিশেষণ দিয়ে চিহ্নিত করলে দারুণভাবে বিভক্ত। সংস্কৃতি, পরিবেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই সংগঠনগুলো ও এ জাতীয় বিভক্তির ঊর্ধ্বে যেতে পারেনি। ফেরদৌস সাজেদিন বলেন, "আমরা এই প্রবাসে আমাদের অসহায় সংস্কৃতিতে যোগ করি আরও একটি অনুষঙ্গ: 'সমিতি'। আদি সোসাইটি, সমিতি, অ্যাসোসিয়েশন ভেঙে ভেঙে গড়ে

উঠল আঞ্চলিক সমিতি। আর তা ভালো হলো না মন্দ হলো ভাববার কোনো অবকাশ নেই। আমরা শুধু গান-বাজনা নিয়েই প্রবাসী হইনি, সঙ্গে বহন করে এনেছি সামগ্রিকভাবে জীবনযাপনের প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ার পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে স্বদেশের রাজনীতি ও তার গুণকীর্তনের প্লাটফরম। ডান, বাম, মধ্যম, কট্টর, উগ্র ইত্যাদি নানাসব দল স্বদেশে যে কর্তব্যটি করতে ব্যর্থ হয়েছে, প্রবাসে থেকে সেই দলগুলোই কর্তব্য পালনে ব্রতী হয়েছে।"(দেখুন, পড়শী, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৭)।

ভাবতে কষ্ট লাগে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে জাহাজ থেকে লাফিয়ে পালানো ইব্রাহিম চৌধুরী, হাবিব উল্লাহ এরা কিন্তু বাঙালিদের একীভূত করার অর্থাৎ আড্ডা দেওয়ার স্থান করে দেওয়ার জন্য রেস্টুরেন্ট খুলেছেন, ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকার জন্মে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। স্টেটেন আইল্যান্ডে কবরের জায়গা কিনেছেন, মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা প্রদানের জন্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশের জন্য চাঁদা তুলেছেন। এর সব কিছুই দেশের প্রতি, বাঙালিদের প্রতি হৃদয় থেকে সদা উৎসারিত প্রেম ভালোবাসার কারণে। লোভলালসা এখানে কাজ করেনি। ইব্রাহিম চৌধুরী তাঁর অনুসারীদের (শিরাজ চৌধুরী, কাজি শামসুদ্দিন আহমেদ, আবু সাইয়িদ চৌধুরী প্রমুখ)নিয়ে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা করেছিলেন। বাঙালি মুসলমানদের বৈধ ইমিগ্রেশন স্বপক্ষে কংগ্রেসে পিটিশনসহ অনেক কিছুই করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে এদেশে বাঙালি ছাত্র যারা পড়াশুনা করছিলেন, তাদের সহায়তা করেছিলেন। এক পর্যায়ে রাণী কবির, সৈয়দা লাকী খালেক প্রমুখ এ উদ্যোগে যুক্ত হন। রাণী কবির ইন্তেকাল করার অব্যবহিত পরেই লীগ অব আমেরিকা সংগঠন হিসেবে নির্জীব হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বছর দু'তিনেকের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক ডাক্তার, ডেন্টিস্ট ও ফার্মাসি গ্রেজুয়েট আমেরিকায় আসেন। নিউইয়র্কেই এদের বেশিরভাগ স্থিত হয়। শুরুতে ব্রংক্স, বিশেষত হারলেম ও আশেপাশে তারা মেস করে থাকতেন। অর্থনৈতিকভাবে চাঙ্গা হয়ে গেলে তারা ধীরে ধীরে জ্যামাইকা, এমনকি লং আইল্যান্ডেও বসবাস শুরু করে। ডিগ্রি, চাকরির চাকচিক্য ও আভিজাত্যে শিক্ষিত এ গ্রুপ হারলেম কেন্দ্রিক আদিবাসী বাঙালিদের সঙ্গে বেশ সামাজিক দূরত্বে চলে যেতে শুরু করে। বাঙালিদের শীর্ষ সংগঠন লীগ অব আমেরিকা পুনরুজ্জীবিত করার কোনো প্রয়াস না নিয়ে শিক্ষিত এ দলটি বাংলাদেশ সোসাইটি গঠন করে। এ সংগঠনটি অদ্যাবধি নানাবিধ বাধাবিঘ্নের মধ্যেও টিকে আছে। আরেকটি উত্তর আমেরিকাভিত্তিক সংগঠন ফোবানা, তবে টিকে আছে বিভক্তির মধ্য দিয়ে। পেশায় শিক্ষিকা, সাহিত্য সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক নাসরিন চৌধুরী ফোবানা সম্বন্ধে বলেন, "গানে গানে, বক্তৃতায়-বিতর্কে, নাটকে, কবিতা আবৃত্তিতে, নৃত্যে, গীতি আলেখ্যে, সেমিনারে ফোবানা জয় তিলক কপালে এঁকে দেবার মতোই শক্তি ও সাহস রাখত। সেই ফোবানা-সম্মেলনেও ভাটা পড়েছে। যে দর্শকরা সাগ্রহে সম্মেলনের জন্য অপেক্ষা করত তাদের অনেকেই এখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তার কারণ দুটি– সম্মেলনের আয়োজন, রেষারেষি, পালটা আয়োজন, কেউ কাউকে ছাড় দিতে নারাজ" (দেখুন, পড়শী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯)।

এ অবস্থা শুধু উপরে উল্লেখিত শীর্ষ পর্যায়ের ক্ষেত্রে যেমন সত্যি তেমনি নিউইয়র্কে বাঙালিদের বাকি প্রায় শ'চারেক সংগঠনের বেলায়ও কমবেশি প্রযোজ্য। বাঙালির সংখ্যা এ-শহরে এখন বেসরকারি হিসেবে লাখ পাঁচেকের মতো। এদের বিনোদনের জন্য আড্ডার প্রয়োজন। সকল ব্যুরোতে বাঙালি অধ্যুষিত পকেটগুলোতে দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট সংখ্যাও বেড়েছে। আড্ডার স্থানের অভাব নেই। তারপর ও জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা হিলসাইড, চার্লস ম্যাকডোনালড ইত্যাদি বাংলাদেশিদের পদচারণায় গমগম করে। আড্ডা হয়, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। এ সব আড্ডা থেকেই রাজনৈতিক মেরুকরণের নিরিখে সংগঠনের জন্ম হয়, খন্ড-বিখন্ড হয়, পাল্টাপাল্টি সংগঠনেরও সৃষ্টি হয়। সারা উত্তর আমেরিকায়, বিশেষত নিউইয়র্কে এসব তৎপরতা চলতে থাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে। খুব কম সংখ্যক জেলারই জেলা পর্যায়ে মাত্র একটি সংগঠন আছে। উপজেলা পর্যায়েও একাধিক সংগঠন, এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়েও তাই। সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলোতেও একই অবস্থা। অতি সম্প্রতি জ্যাকসন হাইসটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের (জেবিবিএ) দ্বিবার্ষিক নির্বাচন হলো। একটি প্যানেল জয় লাভ করেছে বলে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা দিলেও প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল তা প্রত্যাখ্যান করে।

তারা নাকি নির্বাচনে বিভিন্ন অনিয়ম হয়েছে এ মর্মে অভিযোগ নিয়ে আইনের শরণাপন্ন হবেন। নির্বাচনের পূর্বেও একটি গোষ্ঠী যারা পূর্বে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কোর্ট তাদের আবেদন নাকচ করে দেয়। এ রকম ঘটনা এখানকার বিভিন্ন সংগঠন নিয়ে প্রায়ই ঘটছে। অথচ সত্তরের পূর্বে এমনটি কদাচিত ঘটত। এখন অবস্থা এমন যে আমরা চিরায়িত অভ্যাসের বেড়াজাল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারিনি। রাজনৈতিক দল, আদর্শভিত্তিক দল, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, কলাকুশলী, ডাক্তার, কৃষিবিদ সবাই বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত। একজন সাংবাদিক ক্ষোভ করে লিখেছেন, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, পেশাজীবী, স্বেচ্ছাসেবীসহ সংগঠন আছে তিন শতাধিক। তারপর প্রতিমাসেই নূতন দু'একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করছে কমিউনিটিতে। আবার প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলো মামুলি কারণে, অভিযোগে ভেঙে খান খান হচ্ছে। নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বিভেদ, হাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমা। নেতৃত্বের

লড়াই-কোন্দল, ব্যক্তিগত ইগো, রাজনৈতিক বিরোধ, আঞ্চলিকতা ও আর্থিক লেনদেনসহ নানা কারণে সংগঠনগুলো ভেঙে খান খান হচ্ছে। নিউইয়র্কে বাঙালিদের প্রচারমাধ্যম-শিল্প যাতে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ভার্চুয়াল মিডিয়া ইত্যাদি ভিত্তিক প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত, সেগুলোতেও অবস্থা তেমন ভিন্নতর নয়। কবি শামস আল মমিন দাবি করেন যে তার মালিকানায় সাপ্তাহিক দিগন্ত নামে বাংলায় প্রথম সংবাদপত্র বের হয় ১৯৮৫ সালের ১০ই জানুয়ারি। প্রায় আড়াই বছর পর এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এ দাবির স্বপক্ষে ২০২০ সালে সাহাব উদ্দিন সাগর, শামস মমিনসহ একটি আলোচনা সভা ও প্রদর্শনীটিতে পত্রিকাটি নিয়ে আলোচনা করেন। পত্রিকাটির ১২৩টি কপি নিয়ে ৮-৮-২০১৭ সালে একটি প্রদর্শনীও হয়েছিল বলে জানা গেছে। এর পূর্বে ২০১৮ সালে জ্যামাইকায় স্মার্ট একাডেমিয়ায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় পত্রিকাটির প্রতিবেদক সেলিম আহমেদ, সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন শানু, প্রতিবেদক আজম চৌধুরী ও প্রকাশক শফিকুল ইসলাম এক আলোচনা সভাতে পত্রিকাটি এবং যার অর্থানুকূল্যে (শামস আল মমিন) পত্রিকাটি বের হতো তার উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন। লেখক প্রবন্ধটি লিখতে বিভিন্ন সূত্রে তথ্য অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে শমসের মমিন ফটোকপি করে চার পৃষ্ঠার একটি সংবাদপত্র বিলি করেতেন। পরবর্তীকালে পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ানো হয়। আড়াই বছর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এর পূর্বে ১৯৭১ সালে ড. রনজিৎ কুমার দত্তের সম্পাদনায় আংশিক হাতে লেখা ও বাকিটা ফটোকপি করা (কলিকাতার আনান্দবাজার পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি হিসেবে) সংবাদ বিচিত্রা নামে একটি পত্রিকা বের করা হতো। ১৯৭৩-৭৪ সময়ে বদরুজ্জামান খসরু সম্পাদিত পরবাস সাপ্তাহিক পত্রিকাটি টাইপ করে বের করা হতো। সুপ্রসিদ্ধ মসলা ব্যবসায়ী সালেহ আহমেদ পত্রিকাটির অর্থ যোগান দিতেন। খুব সম্ভবত ১৯৯৯ সালে এটি বন্ধ হয়ে যায়। পরীক্ষামূলকভাবে প্রবাসী পত্রিকাটি ১৯৮৪ সালে বের হয়ে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর থেকে নিয়মিতভাবে পাক্ষিক হিসেবে বের হতে শুরু করে। সাপ্তাহিক হিসেবে ১৯৮৯-এ পত্রিকাটি প্রথম বের করা হয়। বিবর্তনের সব ধাপেই সৈয়দ মোহাম্মাদ উল্লাহ সম্পাদক হিসেবে ছিলেন। বন্ধ হয়ে গেলে তিনি সাপ্তাহিক বাঙালি সম্পাদনা শুরু করেন। নিউইয়র্কে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। কৌশিক আহমেদ এখন পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন। প্রয়াত গজনফর আলী চৌধুরীর সম্পাদনায়ার সাপ্তাহিক সংবাদ একটি ভিন্ন স্বাদের সংবাদপত্র ছিল। এটি বন্ধ হয়ে গেলে লেখক নিজে, প্রয়াত আফতাব সৈয়দ এবং ডা. ওয়াজেদ এ খান সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকাটি বের করেন। ডাক্তার হামিদুজ্জামান পত্রিকাটির ব্যয়ভারের সিংহ ভাগ বহন করতেন। একই নামে এখন দুটি পত্রিকা-একটি ডাক্তার ওয়াজেদ এ খান ও আরেকটি ডাক্তার হামিদুজ্জামানের মালিকানায় (২০১৮) মামলার সিদ্ধান্ত মোতাবেকই বের হচ্ছে। সাপ্তাহিক ঠিকানা প্রথম বের হয় ১৯৮৯ সালে। দু'ভাই, এম এম শাহীন ও সাঈদ-উর-রব পত্রিকাটির কর্ণধার। বর্তমানে প্রথমোক্ত জন প্রেসিডেন্ট ও সম্পাদক। নাজমুল আহসানের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পরিচয় বের হচ্ছে গত এক যুগেরও বেশি সময় যাবৎ। এ ছাড়া, সাপ্তাহিক বাংলাও একটি পুরানো পত্রিকা। শুরুতে জুগবেরী খ্যাত মহিবুর রহমান সম্পাদক ছিলেন; এখন আবু তাহের এটির প্রধান নির্বাহী এবং সম্পাদক। একই পদমর্যাদায় তিনি টাইম টিভি পরিচালনা করেন। সাপ্তাহিক প্রথম আলো ইব্রাহিম চৌধুরী'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে আজকাল, জন্মভূমি, দেশবাংলা, বর্ণমালা, হককথা, নবযুগ, মুক্তচিন্তা ইত্যাদি। বেশ ক'টি অন-লাইন পত্রিকাও আছে। টেলিভিশন প্রোগ্রামের মধ্যে দিগন্ত, এটিএন বাংলা, চ্যানেল টিটিটি, চ্যানেল ৭৮৬, টাইম টিভি ইত্যাদি। বিভেদ ও অন্তর্ঘাতে আর একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের প্রেস ক্লাব নিয়ে। কয়েক বছর না যেতেই পুনর্বার বিভক্ত এখন পাঁচটিতে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব নামে তিনটি, বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব নামে একটি এবং অপ্রত্যয়ী হলো আমেরিকান প্রেস ক্লাব অব বাংলাদেশ অরিজিন। একটি পত্রিকা (জন্মভূমি, জানুয়ারি ১৩, ২০২০) পেছনের পাতায় পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হয় এমন করে হেডিং করেছে, "কমুউনিটিতে বাংলাদেশি প্রেসক্লাব নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ, ছি! লজ্জার সাংবাদিকতা"।

আমার পরিচয়

দিমা নেফারতিতি

বিশ্বমঞ্চে সকল অভিবাসীর আসলে দুটি দেশ, দুটি সংস্কৃতি, দুটি ভাষা। আমরা বাঙালিরাও এর বাইরে নই। প্রবাসের যাপিতজীবনে এই অমোঘ সত্যকে মেনে নিয়েই আমাদের এগোতে হয়। বর্তমানে নিউইয়র্ক শহরে বসবাসকালে আমি আবিষ্কার করি, বৈশ্বিক মিশ্র সংস্কৃতির এই শহরে অনেক বাংলা শব্দ আমার ঠোঁট থেকে, চেতনা থেকে নীরবে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছে। সেখানে ক্রমাগত বাড়ছে আমেরিকান ইংলিশের জোর আধিপত্য এবং তাকে উপেক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। তাই, সহজাতভাবে আমি ইংরেজির এই আধিপত্যের কাছে নতি স্বীকার করেছি বৈকি।

কিন্তু, তাই বলে কি আমার মায়ের ভাষা বাংলাকে বিদায় জানিয়েছি, নিঃসন্দেহে তা নয়। বাংলার অমৃতসুধা যে আমার শিরায় শিরায়, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। সবকিছুর আগে আমার প্রথম পরিচয়, আমি বাঙালি। আমার জাতিসত্তা, আমার মায়ের ভাষা এসবই আমার আত্মপরিচয়, এর শেকড়।

তাই এই শহরে সারা সপ্তাহ কর্মক্ষেত্রে কাটে ইংলিশের দাপটের কাছে নমিত হয়ে, স্যান্ডউইচ, পিৎসা, পাস্তার সঙ্গে সখ্য করে।

কিন্ত, ছুটির দিনগুলো যেমন আমার জন্য মুখিয়ে থাকে, তেমনি আমি মুখিয়ে থাকি প্রাণের টানে বাংলার জলে অবগাহন করতে। তখন কাছে টেনে নেই রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের গান, বাংলা কবিতা, বিকেলে চায়ের সঙ্গে সর্ষের তেল-ধনেপাতা দিয়ে মাখানো ঝালমুড়ি, পরিবারের সঙ্গে অবিরল বাংলায় কথা বলা, বন্ধুদের সঙ্গে পিঠা-পুলি, চটপটি-ফুচকার আয়োজন এবং প্রাণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- আড্ডায় উপস্থিতি। সেই সঙ্গে একজন গণমাধ্যম ব্যাক্তিত্ব হিসেবে চেষ্টা করি, প্রবাসে নানারকম টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রসার অব্যাহত রাখতে। প্রবাসে বাংলাচর্চা, বাংলায় অবগাহন আমাদের যেমন শেকড়ের কাছে পৌঁছানোর তৃষা মেটায়, তেমনি বিশ্বমঞ্চে আমাদের আত্মপরিচয়কে ঋদ্ধ করে। তাই প্রত্যেককেই তার নিজস্ব প্রেক্ষাপট থেকে, প্রবাসে বহুমাত্রিকভাবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের আত্মপরিচয়কে সুসংহত করবার জন্য।

গল্প

যেন হৃত যেন বিস্মৃত সংগ্রাম

ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

কেউ জাতিস্মর নয়। জীবনের সব কথাই সকলের মনে থাকে না। তবুও।

এক

এই সামনে বসে তাঁকে স্পষ্ট দেখা যাবে না। চেহারায় নানা বর্ণ আছে; বয়স নানা রং দেয়। এখন সেই পোড়া তামাটে রং বিদ্যুতের আলোয় প্রায় বিলীন। একটু পরে পাদপ্রদীপের আলোয়, চাই কি ছুঁড়ে দেওয়া আলোয়, সেই রংও অদৃশ্য হয়ে যাবে!

এ-রকম পোশাকেও নয়। সময়, কর্ম শরীরে অনেক কথা লিখে দেয়, পোশাক সব ঢেকে রাখে।

এই পাশ থেকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে।

সাদা দেয়ালের গায়ে তাঁর মুখের রেখায় তবুও অন্ধকারের ছাপ। সামান্য ঘাড় ফেরালে কিছু আলোর কণা তাঁর অবশিষ্ট শ্বেতকেশ বড় স্পষ্ট করে, তাই এইভাবে সম্পূর্ণ অন্ধকারে মুখ, চোখ, চুল, পোশাক ছাড়া কেবল অস্তিত্বহীন কেউ থাকে না।

বরং তাঁকে পেছন থেকে দেখা যাক। পাদপ্রদীপের আলো তাঁর মুখে। এখান থেকে দেখলেই নিরাবয়ব তিনি স্পষ্ট।

দুই

আমি তাঁর সঙ্গে সর্বদাই থাকি তবুও যে তিনি আমাকে সবসময় দেখতে পান, এমন নয়। নিদ্রাকালে ত নয়-ই।

তিন

টেলিফোন হাতে তুলে নেন তিনি। প্রথম কথাটি বলবার সময়ে তাঁর গলা স্থির ছিল। পরমুহূর্তে সেটা অস্থির হলে, বোঝা যায় টেলিফোনের অপরপ্রান্তে যে আছে, তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় খুব দৃঢ় নয়। না হলে স্বচ্ছন্দেই তিনি বলে দিতেন কোন্ হোটেলে ওই দল উঠেছে। সব খবর-ই তাঁর জানা। খবর যারা তৈরি করে তাদের-ই একজন হয়ে তিনি সেখানে বসে আছেন। যদিও ওই মুহূর্তে সব সংবাদই যে তাঁর কাছে আসে এমন নয়। এতে তাঁর অস্বস্তি, উদ্বেগ আরও বাড়ে। নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টায় তিনি সফল নন বোঝা যায়।

কী দরকার তাদের ঐ ঠিকানায়? নিম্নস্বরেই বলেন তিনি। এবং পর মুহূর্তেই কিছু না-ভেবেই বুঝি মোটা দাগে হোটেলের নামটি বলেন। ভাবনা বুঝি এই ছিল যে, সঠিক হদিশ না দিলে কেউ সেখানে পৌঁছুতে পারবে না। তাঁর মুখে আলোছায়ার খেলা, উদ্বেগ কি অস্বস্তির আসা-যাওয়া দেখবার মতো সেখানে আর কেউ নেই এই বুঝি ভাবেন তিনি। আমি সেটি বুঝি।

আসন ছেড়ে উঠে আসেন। দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেও চোখ খুলে কিছু দেখেন না। তবুও কিছু দেখার ইচ্ছে না-থাকলেও চোখ তো তাঁকে খুলতেই হবে– চেয়ারে ফিরে যাবার জন্যেও। আর মুহূর্তে যদি ডাক পড়ে মহা-অধিকারীকের ঘরে যাওয়ার জন্য, তাহলে দরজার নিশানা খোঁজবার জন্যেও তো তাঁকে চোখ খুলতেই হবে। এবং এই চোখ খোলা বন্ধ করা, দেয়ালের দিক থেকে সরে চেয়ারে বসা অথবা দরজার দিকে উঠে যাওয়ার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন, তা তাঁর আছে—এই বুঝি ভাবেন।

বড় রাস্তার ওপরেই প্রসিদ্ধ পান্থনিবাস। নানা বর্ণের নানা পোশাকের নিবাসীদের সর্বদা যাওয়া-আসা। সকলের মুখের দিকেই যে কেউ তাকিয়ে থাকে এমন নয়, তবু তারা নিজেকে স্পষ্ট করতে না চাইলে আড়ালেই থাকে। তিনিও বুঝি অমন। না-হলে আট-দশ জনের ছোট্ট দলটি যখন দরজা খুলে ধরে অন্যদের সঙ্গে তাঁর-ওতো ভেতরে ঢুকে যাওয়া উচিত ছিল। তবুও আড়ালেই রয়ে যান তিনি।

কিন্তু অমন করে অনেক সময় কাটানো যায় না। তিনি দরজার সামনেই চলে আসেন। এবং যারা গেছিলো ভেতরে বুঝি বাইরে এলে তাদের জিজ্ঞেস করা, তাঁর কথা কি কোনো মতে কোনো প্রসঙ্গে আলোচনায় এসেছিল।?

চার

তাঁর সাজানো ঘরে ঢুকেই মনে হয়েছিল কাজটা ঠিক হয়নি। না-এলেই বুঝি ভালো হতো।

ঘরে ঢোকা সকলের দিকে তাকিয়ে ভারীমুখে বসে ছিলেন

তিনি। সকলেই যে তাঁর অমন মুখ দেখতে পায় আমার দিকে তাকালেই বুঝতে পারতেন তিনি। কিন্তু ওমন করে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় তখন। সমাগত কয়েকজনের হাতে কিছু প্রচারপত্র কিছু পুস্তিকা তাঁকে ভাবায়। কেউ তাঁর হাতে দু'একটি প্রচারপত্র তুলেও দেয়। সেইসব দেখে তাঁর মুখ আরো গম্ভীর হয়।

"আমার অসুবিধা আছে" সংক্ষেপে মন্তব্য করেন তিনি। "তাছাড়া আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। সব-ই চলে গেছে।" তাঁর চাকরির ধরন-ই এমন এক বন্দরে নৌকা বেঁধে থাকা হয় না দীর্ঘকাল কোনো সময়েই। সামান্য ঝড় এলেই সেটি টালমাটাল। এটিই বোঝানোর চেষ্টা ছিল বুঝি।

ঘরে ঢুকেই সকলে যে যেমন পারে বসেছিল। কিছু আশা, কিছু স্বস্তি, কিছু ভরসার কথাই ভেবেছিল তারা। এখন তাঁর মুখের কথা শুনে ভাবতে শুরু করে। কেউ কেউ বলেও বুঝি, "কোনো পথ যে আর নেই, সে কি বোঝা যায় না? তা ছাড়া অন্য কোনো পথের কথাও তো আমরা জানি না!"

"আপনি আমাদের সঙ্গে এলে ভালো হতো", বলে অনেকক্ষণ বসে থাকে তারা। তবুও নিঃশব্দ তাকে দেখে উঠে পড়ে সকলে। এক-ই কথা আবার বলে "এই এক-ই পথের কথা জানি আমরা।" বলে দরজা খুলে বেরিয়ে যায় সকলে।

যাওয়া ঘরে আর ঢোকা যাবে না। কিসের চিন্তা তাঁর। নিশ্চিত ভবিষ্যৎ কেউ দেখে না, কেউ জানে না, কিছু অজানা তো থাকবেই। তবুও স্থির সংকল্পের কোনো বিকল্প নেই।
সকলে চলে গেলে ঘরের এ-মাথা ও-মাথায় আবার সেই অস্থির পদচারণা।

মাঝে মাঝে ঘরের বাইরেও যান তিনি। শহরের রাস্তায় ঘোরবার জন্যে নয়। লক্ষ্য রাখেন পরিচিত চেহারার কোনো মিছিল কি জমায়েত চোখে পড়ে কিনা। এমন নয় যে, ওমন কোনো সভা বা শোভাযাত্রা দেখলেই তাতে তিনি শামিল হবেন। বরং তিনি যেন কারো চোখে না-পড়েন সেটিই চেষ্টা। ঘরে বসে থাকাই তাই ভালো; কিন্তু কোনোমতে পারা যায় না। কাছে, দূরে, আরো দূরে কী ঘটে চলেছে জানা না-গেলে চলবে না–এটিও বোঝেন। তবুও এমন।

দু-একবার দূর-শহরেও গেছেন তিনি। দূর-শহরের নিজ চেহারার মানুষের অঞ্চলে বড় রাস্তায় কি প্লাজায় চেনা চেহারার মানুষের জমায়েত কি মিছিল হয় কি-না দেখবার জন্যেই সম্ভবত। এতো বড় শহরের চওড়া রাস্তায় এপার থেকে ওপারের মানুষই চেনা শক্ত। তাই তাঁকে চিনবে কে? ওই সব কথাই আমার জানা।

আবারও তারা তাঁর ঘরে আসে–সকলে নয় দু-চারজনই মাত্র। বলে, 'বেরিয়ে আসুন। আর মাত্র কিছুদিনই তো।'

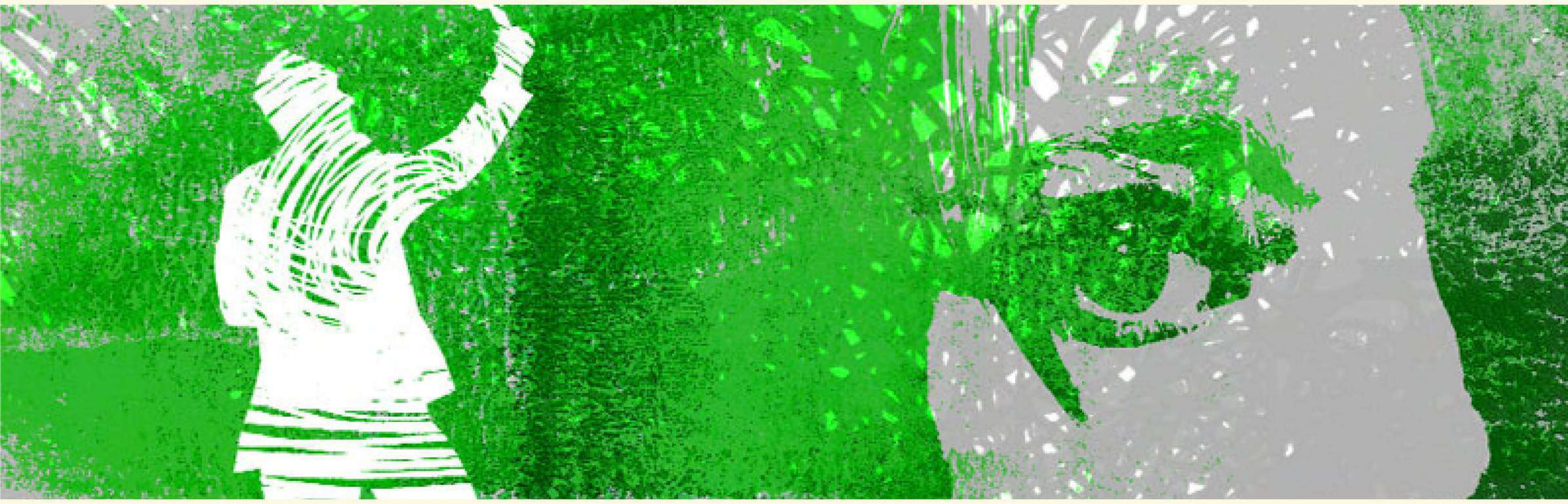

একলা ঘরে বসে থাকেন তিনি। ভিন্নমত ভিন্নপথের চিন্তা তাকে পীড়িত করে কি? তার মুখ দেখে সেটি বোঝা যায়। সকলের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে দরজা বন্ধ করতে উঠে যান তিনি। যদিও আমার দিকে চোখ পড়ে না তাঁর।

ঘরেই বসে আছেন আজ কদিন। নানা কথা কানে আসে। কর্মস্থলে নানাজনের চোখের ভাষা পড়তে অসুবিধা হয় না তাঁর। সন্দেহ কি, অপছন্দ কি নিন্দা কোনো কিছুরই মুখোমুখি হবার ক্ষমতা নেই ভেবে ঘরেই বসে আছেন তিনি।

আর অমনই এক দিনে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়া সকলে ফিরে আসে। সকলেই সাহসী নয়, সকলেই নিশ্চিন্ত নয়, তবুও তারা আবার আসে। ঘরে বসে থেকে কোনো লাভ নেই। ভেঙে

সাহসের বড় অভাব তাঁর চিরকালই।

পাঁচ

আজ রৌদ্রের দিন। বাতাসেরও। স্বচ্ছন্দে বাইরে হেঁটে বেড়ানো যায়। হোটেলের লবিতে তাঁর জন্য যারা প্রতীক্ষারত–সকলকে তিনি চেনেন না। ভিন্ন সময়, ভিন্ন মানুষের যাতায়াত। পরিচিত বলয়ও কত সহজে পালটে যায়। যারা তাঁর ঘরে বারবার এসেও ফিরে গেছে শূন্যমনে তাদের কেউ সামনে কি পেছনে নেই। থাকবার কথাও নয়। যারা আছে তারা এই সংগ্রামী পুরুষের সান্নিধ্যে গর্বিত। শত বাধা-বিপদ পায়ে ঠেলে শত্রুপুরী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি, জানে স্বাধীন দেশের সরকারি মহল। তারাও তাকে ঘিরে থাকে সর্বদাই। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নায়ক তিনি, তাঁর চারপাশে প্রসাদপ্রার্থী থাকবেই বা না কেন?

অনুষ্ঠানস্থল খুব দূরে নয়। সতেজ রৌদ্র আর খোলা বাতাসের দিনে এই পথ সহজেই হেঁটে পার হওয়া যায় ভেবে সকলে তাঁর সামনে-পেছনে নানা স্বস্তিবচনের শব্দ তুলে এগোতে থাকে। কিন্তু তাঁর চোখে সে পড়ে না। অথবা তাকে তিনি চিনতে পারেন না–সে রাস্তার অপরপারে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি দেখেননি–অথবা চিনতে পারেননি; কিন্তু আমি তাকে দেখামাত্রই চিনেছি। বিদেশি কৃতবিদ্য ছাত্র–শিক্ষাশেষে সফল পেশায় কতজনই থেকে যায়, অমনি একজন কেউ।

ছয়

উজ্জ্বল মঞ্চে পরপর বসে আছেন তাঁরা। সম্মানিত অতিথি, সরকারের প্রতিনিধি, পৌরসভার কর্মকর্তা–সকলেই। দুই শহরের মেলবন্ধন ঘোষণা করা হবে। সাতসমুদ্রের এপার-ওপারের দুই শহর, দুই দেশ কঠিন সময়ে পরস্পরের মুখের দিকে না-তাকালেও এখন উভয়ের দৃষ্টিতেই সৌহার্দ্য জন্ম নিতেই পারে।

'আমরা একই পথ দিয়ে একই লক্ষ্যে পৌঁছেছি', মেয়রের গলা শোনা যায়। ইতিহাসে সময়ের ব্যবধান বড় কথা নয়। লক্ষ্য ও অভিন্ন গন্তব্যই প্রধান। ক্ষমতাসীন বিদেশি প্রতিনিধির দিকে তাকিয়ে মেয়র বলেন, 'আপনার দেশকে এই সম্মান দেখাতে পেরে আমরা গর্বিত।' মেয়র তার আসনে ফিরে এলেন। করতালির প্রবল শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বৃত্তে এবারে এসে দাঁড়ালেন অতিথি। অত্যুজ্জ্বল আলোর বৃত্তে। পনেরো কোটি মানুষ এখন কথা বলে। দীর্ঘকালের ঘটনা নয়। তবুও পার হওয়া সময়ের কথা ভেবে, পক্ষ-বিপক্ষ না-ভেবে, সংগ্রামের কথা বলবেন তিনি। সেইসব কথা। সেইসব অমর মানুষ। তিনি তাদের প্রতিনিধি। 'যোজন বিস্তৃত রক্তের স্রোত পার হয়ে আমরা আজ এসে দাঁড়িয়েছি, মুক্ত মানুষ। আপনাদেরই মতো।' তাঁর আবেগমথিত স্বর শোনা যায়।

বয়স্ক অধ্যাপক এখন তিনি। অফিসঘরটি অনেক বড়। ঘরের জানালাটিও অনেক বড়। ক্লাসের শেষে পরদিনের প্রস্তুতি নিতে নিতে প্রায়ই সেই জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকেন তিনি। জানালার পাশে একটি হেলানো চেয়ারও আছে। সেখানে বসে দূর-সবুজ পাহাড়ের সীমানা ছাড়িয়ে আরও দূর-বিশাল জলরাশির ওপারে, আরেক সবুজের কথা মনে পড়লে চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন।

গতকালই টেলিফোন এসেছিল পুরাতন সতীর্থের। সেই সদলে ঘরে ঢোকার কয়েকজনের একজন বয়সের ভারে এখনো পীড়িত নন, তাই নানা উপলক্ষে নানা স্থানে যাতায়াত তাঁর। 'কী যাবেন না? মন্ত্রী নিজে এসেছেন, এই প্রথম, এত বড় সম্মান!'
'কার্ড পাইনি।' হেসে বলেছিলেন অধ্যাপক। স্মৃতি ও মেধার জন্য সর্ববিদিত এ-কথা মনে এলে আবারও হেসে বলেন অধ্যাপক, 'আর অনেক দূরও তো।'
টেলিফোনের অন্য প্রান্তের বান্ধব হিসাবে ভুল করেন না। তিনিও তাই হেসেই বলেন, 'ঝকঝকে শেষ মার্চের দুপুরে আশি মাইল পথ–অনেক দূর নিশ্চয়ই।'

সাত

অনেক পেছনে দাঁড়িয়েছিল সে। কারও চোখে পড়েনি। কেউ তাকে চেনে না তাই। কিন্তু আমি তাকে ঠিকই দেখতে পাই।

এত দূর থেকে কেউ কাউকে দেখতে পাবে না, চিনবে না ভেবে সে আরও সামনে আসে। একেবারে সামনে। ঠিক মঞ্চের নিচে। এত মানুষ বসে আছে। হেঁটে হেঁটে তাঁর সামনে এলে তার ওপরে চোখ পড়বেই–ভাবে বুঝি সে। মনে পড়বেই সেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা দিনের কথা।
কিন্তু সাতচল্লিশ বছর বড় কম সময় নয়। জন্মান্তরের কথাই প্রায়। শ্বেত কেশরাশিতে দু-কানের পাশ ঢাকা। বাতাসে উড়ছিল তারা। হাত দিয়ে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে সে। এই সাদা যেন চোখে না পড়ে। সময় সব ভুলিয়ে দেয় এজন্যেই বুঝি। তবুও তিনি তাকে চিনবেন না, সে ভাবে।
আমি জানি তিনি তাকে ঠিকই চিনবেন–যে-মুহূর্তে আমি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াব। নিজেকে কে না চেনে!

চিত্রাঙ্গদা নয় কেউ

ড. পূরবী বসু

এক

"এই যে দুটি ছোট্ট বলের মতো মাংসপিণ্ড দেখছ, এগুলোই তোমার ওভারি। তোমার শরীরে মেয়েদের হরমোন এস্ট্রোজেন আর প্রজেস্টারোন বানাত এগুলো। অর্থাৎ এই ছোট্ট বল দুটিই প্রধানত তোমাকে এতো বছর ধরে মেয়ে করে রেখেছিল। সন্তান তৈরির জন্যে মেয়েদের যে ডিম্বাণুর দরকার হয়, সেটাও আসে এই ওভারি থেকেই।" ডাক্তার এই কঠিন কঠিন শব্দগুলো যতটা সম্ভব ধীরে ধীরে উচ্চারণ করার চেষ্টা করেন। তবে এগুলো সব-ই তো আমার কাছে অতি পরিচিত এখন। কিছুই নতুন মনে হয় না। একটু থেমে ডাক্তার আবার বলেন, "গত কিছুকাল ধরে যে তোমাকে নানারকম ওষুধ খাওয়াচ্ছিলাম, ইঞ্জেকশন দিচ্ছিলাম, তা আসলে এই বল দুটোকে নিষ্ক্রিয় করে দেবার জন্যেই; মানে মেয়ে হরমোনের কাজকর্ম চেপে রাখার জন্যে।"

ডাক্তারের নির্দেশ মতো বিছানার সামনের দেয়ালে যে বিশাল আয়না রয়েছে, সেদিকে তাকায় মুকুল। দেখতে পায়, তার শায়িত শরীর থেকে কয়েক ফুট সামনে স্টেইনলেস স্টিলের এক ঝুলন্ত ট্রে। ট্রের ওপর টান টান করে পাতা রয়েছে কয়েক প্রস্থের সাদা টিস্যু পেপার। সেখানে, সেই টিস্যু পেপারের ওপরেই রাখা হয়েছে সদ্য পেট থেকে বের করে আনা তাজা রক্তে ভেজা লাল টুকটুকে দুটো বল। প্রতিটি বলের সঙ্গে লাগানো রয়েছে একটি করে লম্বা মিহি দড়ির মতো সরু, মাংসালো গ্রন্থি।

মুকুলের খুব ইচ্ছে হয় আলগোছে বল দু'টোকে নিজের হাতে তুলে নেয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ভাবতে অবাক লাগে মুকুলের, এই বস্তুগুলো তার পেটের ভেতর ছিল এতকাল। এই ছোট্ট ছোট্ট প্রত্যঙ্গগুলো রেখেছিল তাকে, সে যা নয়, কখনো নিজেকে যা ভাবে না, তাই করে। আজন্ম। ওগুলোকে নিজের হাতে ধরার-স্পর্শ করার দুর্নিবার এক স্পৃহা অনেক কষ্টে দমন করে সে । ওভারি দু'টোকে শরীরের বাইরে দেখে ভালো লাগে মুকুলের। নিশ্চিন্ত হয়। আঃ! কী শান্তি! কী ভীষণ তৃপ্তির দিন আজ! এ যে কত বড় পাওয়া। কী সাধের অর্জন! আজকে জীবনে প্রথমবারের মতো পৃথিবীর কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারবে মুকুল সেই রূপে, যেভাবে নিজেকে সবসময় ভেবে এসেছে সে,

যেভাবে বোধ করেছে, যেভাবে নিজেকে দেখতে চেয়েছে। সে সত্যি সত্যি অবশেষে মুক্তি পাবে নিজের শরীরের এই অবাঞ্ছিত বেড়াজাল থেকে। এখনো বিশ্বাস হয় না যেন। আর কী অদ্ভুত! এই মুহূর্তে সবাইকে ডিঙ্গিয়ে, সব কিছু ছাপিয়ে শুধু একটি মুখ-ই চোখের সামনে ভেসে উঠছে, যে মুখ মার নয়, বাবার নয়, বড় দুই বোনের নয়, এমনকি শীলা নামে তার যে প্রিয় সহপাঠী, যাকে দেখলে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে, সব না-পাওয়া মুহূর্তে ভুলে যাওয়া যায়, তার-ও নয়। সে মুখ রতন চৌধুরীর। মুকুলের খুব ইচ্ছা হয় রতন চৌধুরীকে ডেকে এনে তার হাতে তুলে দেয় এই রক্তাক্ত ওভারি দুটো। রতন চৌধুরী, দেখ, কেমন হেরে গেলে তুমি আমার কাছে। প্রায় বাপের বয়সী হয়েও কত লোভ ছিল তোমার এই শরীরটার ওপর। সবার চোখের আড়ালে যখনি এক মুহূর্তের জন্য কাছে পেতে আমাকে, তক্ষুণি তোমার হাত চলে যেত আমার বুকের ওপর, তারপর সুযোগ পেলে ঢোলা হাফপ্যান্টের ভেতরও। তুমি বলতে, ভয় দেখাতে, কোথাও আমার বিয়ে হবে না। আমার মতো পুরুষালি মেয়েকে কেউ নাকি বিয়ে করবে না। তবে তুমি করবে। কারণ মামা হলেও তোমার সঙ্গে আমার রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি বলতে, আমাকে বিয়ে করার জন্যে দরকার হলে জোর করে তুমি আমায় পেট বাঁধিয়ে দেবে। মুকুলের খুব সখ হয় ওভারী দু'টো দুই হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে শূন্যে তুলে ধরে ওপরের দিকে। ইচ্ছা হয়, দূরবর্তী রতন চৌধুরীর উদ্দেশে টোস্ট করে বলে, 'এই নাও আমার ওভারি। এবার ফিরিয়ে নাও আমাকে দিয়ে তোমার সন্তানের দুরাশা।'

"আগাছার মতো এ দুটোকে আজ উপড়ে তুলে আনা হয়েছে আমার শরীর থেকে। ওরা এখন মৃত। তোমাকে আর তোমার আশাপূরণ করতে দিল না এগুলো। সরি।"

তলাবিহীন, পেছন কাটা সবুজ রঙের সার্জারির পোশাকটির ঘাড়ের নিচে বোতামটা লাগানো নেই। বুক থেকে জামাটা সরিয়ে নিজের ধবধবে ফর্সা ল্যাপাপোঁছা বক্ষের দিকে তাকায় মুকুল। মাত্র কয়েক মাসের চিকিৎসায় কী সাংঘাতিক পরিবর্তন! বুকের হাড়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে, মিশে আছে মসৃণ একপ্রস্থ চামড়ার প্রলেপ। দু' পাশে দুটো গোলাকার কৃষ্ণ বর্ণের ছোপের মাঝখানে ছোট্ট বোঁটা ছাড়া পুরো বক্ষ আজ চড়াই-উৎরাই-রহিত মসৃণ এক সমতল ভূমি। পরিচ্ছন্ন, ধবধবে শুভ্র। সার্জারি করার আগেই নানা রকম পুরুষ হরমোন আর নারী-শত্রু-হরমোনের মধ্যে খেলা খেলিয়ে স্তনের উত্থান ও সুডৌল গঠন পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়েছিল ডাক্তার। এখন আর ঐ ফাঁকা জায়গার দিকে হাবার মতো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না পাড়ার উঠতি বয়সী ছেলেগুলো। ওদের লোভী চোখ এখন সরে যাবে অন্যত্র। খুঁজে বেড়াবে ঈপ্সিত বস্তু অন্য কোনো শরীরে।

"তোদের চোখে থুতু মারি, অসভ্যের দল।"

বেশ জোরে জোরেই কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে আসে মুকুলের। সেই সঙ্গে থু করে থুতু ছিটাবার চেষ্টাও করে। কিন্তু সার্জারির জন্য গতকাল বিকেল থেকে কিছু মুখে না দেওয়ায় তার ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, শুকনো মুখ বা জিহবা থেকে কোনো তরল পদার্থ বেরোয় না। তবু নার্স এসে মুখের বাইরেটা টিস্যু দিয়ে সযত্নে মুছিয়ে দেয়। বাড়তি দু'টি টিস্যু ধরিয়ে দেয় মুকুলের দুই হাতে। সার্জন, আর তার সাহায্যকারী দুই ডাক্তার স্বভাবত-ই একটু চমকে নড়েচড়ে ওঠে। নার্স তার বাঁ হাত দিয়ে মাথার ক্যাপটা ঠিক করে নেয় একটু। যদিও তারা ওর ভাষা বোঝে বলে মনে হয় না। গর্বিত, পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে নিজের বুকের দিকে আবার ভালো করে তাকায় মুকুল। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে, আরও কয়েক মাস ওষুধ খাবার পর বুকের মাঝখানটা ভরে যাবে ছোট ছোট কালো চুলে। তাইতো! বুকের ভেতর লোম না থাকলে সে আবার কেমন পুরুষমানুষ হলো! সীমারের মতো দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুর-ই শুধু ভাববে না লোকে, দেখতেও লাগবে তাকে কী রকম অস্বাভাবিক।

অপারেশন টেবিলে অজ্ঞান হতে চায়নি মুকুল। স্পষ্ট করে সার্জনদের জানিয়েছিল তার এই নবজন্ম যেন সে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় অনুভব করতে পারে। ঘুমের আড়ালেই যেন এত বড় ঘটনাটি, তার সারাজীবনের স্বপ্ন–এই বাঞ্ছিত রূপান্তর ঘটে না যায়। ফলে ডাক্তার তাকে জেনারেল না দিয়ে এপিডুরাল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়েছে। মুকুল তাতে করে শরীরের নিম্নাঙ্গের কাটাছেঁড়া-সংস্থাপনের ব্যথা-যন্ত্রণা টের পাবে না ঠিকই, কিন্তু বড় বড় ঘটনাগুলো-শরীরে বিশেষ বিশেষ বিয়োজন-সংযোজনগুলোর কথা শুনতে পাবে–প্রতিটি বাঞ্ছিত ধাপই নিজের দুই চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে পারবে–সরাসরি অথবা আয়নার প্রতিফলনে। অপারেশন থিয়েটারের চার দেয়ালেই সাঁটানো আছে বিশাল বিশাল সব আয়না, যা প্রয়োজনে ঢেকেও রাখা যায়। আজ মুকুলের বিশেষ ইচ্ছায় সেসব উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে সার্জারির আগাগোড়া সবই প্রত্যক্ষ করেছে সে। জন্মান্তরে-পরকালে অবিশ্বাসী মুকুলের এক জীবনেই নবজন্ম ঘটে যায়। আর সেটা ঘটে তার-ই নিজের ইচ্ছায়–নিজের চোখের সামনে।

দুই

ছোট বেলার কথা মনে পড়ে তার। দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে নিজের শরীরটাকে ক্রমশ ঘৃণা করতে শুরু করেছিল মুকুল।

এমন একটা সময় গেছে, অন্য ভিটার তিনটি নবজাতককে (দু'টি ছেলে; একটি মেয়ে) সাতসকালে তেল মাখিয়ে ন্যাংটো করে উঠানের রোদে শুইয়ে রাখা হতো শক্তিশালী হাতপা নিয়ে যাতে বড় হয় তারা। সূর্যসেঁকা সেই সব বস্ত্রহীন শিশুদের বিশেষ অঙ্গের সঙ্গে নিজেরটির সাদৃশ্য তুলনা করে হতাশ হতো মুকুল। মনে হতো ওদের কারোর মতোই ঠিক দেখতে নয় সে। মাকে জিজ্ঞেস করলে মা হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে পড়ত। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টায় হেসে বলত, "তাইতো তোর নাম মুকুল রেখেছি সোনা। এখনো তো কুঁড়ি তুই। ফুল হয়ে ফোট তো আগে! তখন দেখবো তুই গন্ধরাজ না চাঁপা।"

শুনেছে বিয়ের আগে কবিতা লিখত মা। মায়ের এ ধরনের তামাশা বা ধাঁধা সান্ত্বনা দেয় না মুকুলকে। সে আরও বিব্রত, বিমর্ষ ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। নিজেকে, নিজের দেহকে অপরিচিত ঠেকে তার কাছে। মনে হয় মুকুল নামক অপরিণত এই শরীরটির খোলসে অন্য আর একজনকে যেন বসিয়ে দিয়ে গেছে কেউ। যে শরীর সে টেনে বেড়াচ্ছে, সেটা তার নিজের নয়। একে সে চেনে না যেমন, এই দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা আকর্ষণ-ও নেই তার। ভালোবাসাত নেই-ই।

সে যে তার নিজের শরীরকে ভালোবাসে না, এটা প্রমাণ করতে মাঝে মাঝেই ইচ্ছা করে রান্না ঘরের তার বের করা ভাঙ্গা সুইচে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে ইলেকট্রিক শক খেত আর হা হা করে একা

একাই হাসত। মুকুলদের আত্মীয়স্বজন বা নিকট প্রতিবেশী কেউ দেখে ফেললে তাকে মানসিক ডাক্তার দেখাবার পরামর্শ দিত। এভাবেই কেটে যায় জীবনের প্রথম দিকের বেশ ক'টি বছর। কষ্টকর হলেও সেটা মারাত্মক অসহনীয় ছিল না তখন। বুড়ি, পুষ্প, শোভাদের সঙ্গে পুতুলের বিয়ে বা রান্নাবাড়ার খেলা খেলতে ভালো লাগতো না তার, এটা সত্য। অন্যদিকে আবির, খোকন, পল্লবরা তাকে ক্রিকেট কিংবা ডাংগুলি খেলায় অংশ নিতে দিতে তেমন আগ্রহ দেখাত না যখন, নিজেকে কেমন অপাঙ্‌ক্তেয়, পরিত্যক্ত মনে হতো তার। তা সত্ত্বেও হাঁড়ি-পাতিল আর বল-মার্বেলের দুই পৃথক দলের সঙ্গেই খেলাধুলা করা বা সখ্য বজায় রাখা তেমন কঠিন কাজ বা চ্যালেঞ্জ ছিল না মুকুলের জন্যে। শেষ পর্যন্ত একটি সমঝোতায় এসে সবার সঙ্গেই কম বেশি খেলত সে। ফলে দিন কেটে যেত মোটামুটি নির্বিঘ্নেই। শুধু মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার চেষ্টা থেকে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেললে চিন্তিত মা-বাবাকে আড়ালে ফিসফিস করে কথা বলতে শুনেছে। এলোপ্যাথিক ডাক্তার মুখ ভারী করা নাম "ইউরোনারি ইনকন্টিনেন্স" শনাক্ত করে রক্তসহ কিডনি ও ব্লাডারের বহুরকম পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আপাতত কয়েকটি কড়া ওষুধ। অবশেষে অন্য কারোর পরামর্শে এলোপ্যাথিক ছেড়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাওয়ানো চলে বেশ কিছুকাল। কিন্তু উপসর্গটা নিরাময় হয়ে গেছে ভেবে যেই বাড়ির সকলে নিশ্চিন্ত, তখন মুকুল আবার একদিন জিন্সের হাফ প্যান্ট ভিজিয়ে মাথা নিচু করে টয়লেট থেকে বেরোয়। তার কেবল-ই মনে হতে থাকে, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার মতো এতো স্বাভাবিক ও সহজ কাজটা করতে পারাটা তার জন্যে বড় জরুরি ছিল। এটা পারা উচিত ছিল তার। কিন্তু কিছুতেই পারে না সে তা করতে। প্রস্রাবের ফোয়ারা ধনুকের মতো ঊর্ধ্বমুখী না হয়ে নিম্নমুখী জলপ্রপাত হয়ে পরিহিত প্যান্ট ভিজিয়ে দেয়। তখন থেকেই কিনা কে জানে, নিজের শরীরটাকে তার কাছে আরও বেশি অপরিচিত ও অবাঞ্ছিত মনে হতে থাকে। নববর্ষে নতুন কাপড় পরে এ বাসার সকলে। এটা বহুদিনের রেওয়াজ। অপেক্ষাকৃত ভালো রান্না হয় সেদিন। ভাবখানা এমন, বছরের প্রথম দিনে যা করবে সারা বছর তেমনি ভালো ও সচ্ছল কাটবে। বাড়ির অন্য মেয়েরা যখন কুঁচি দেওয়া, লেস বসানো, ফোলা ফোলা, নরম ফ্রকের অর্ডার করে দর্জির দোকানে, মুকুল জিন্সের প্যান্ট কিংবা হাফপ্যান্টের সঙ্গে সাধারণ সুতি টি-শার্টের বায়না ধরে। কেউ তেমন কিছু মনে করে না। খুব আপত্তিও তোলে না। ওর খুশিমতো পোশাক-ই কিনে দেওয়া হয় । আজকাল অল্প বয়সে অনেক ছেলেমেয়েই এমন অভিন্ন লিঙ্গের জিন্স-টি শার্ট জাতীয় পোশাক পরে থাকে। এর জন্যে উতলা হয়ে লাভ নেই। হবার কারণও নেই। মনমতো পোশাক পেয়ে মুকুল খুশি। বাড়ির অন্য সকলেও খুশি। কারও কাছে কিছু মনে হয় না। মুকুলের কাছে তো নয়-ই। মুকুলের কোনো ভাই নেই। তার বড় দু'জনেই বোন। ফলে মকুলের এই ছোট করে চুল ছাটাই করা বা সবসময় প্যান্টশার্ট পরে থাকাতে তাদের পিতামাতা প্রথম প্রথম খুব অখুশি হননি। ঐ পোশাকে মুকুল হয়তো তাঁদের দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে সাহায্য-ই করত। অস্বীকার করে লাভ নেই, সাক্ষাৎ রুনি মামীর কাছ থেকে শোনা, দুই মেয়ের পর একটি পুত্র সন্তানের ধিকিধিকি আশাতেই তৃতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হতে রাজি হয়েছিল মুকুলের মা। পিতার মনেও পুত্রস্পৃহা একেবারে ছিল না বলা যায় না। তবে পুত্রকন্যার ব্যাপারটা মুখ্য কোনো বিষয় ছিল না এ বাড়িতে। এজন্যে পরিবারের কারোর কোনো আশাভঙ্গ বা মনোবেদনার চিহ্ন দেখা যায়নি কখনো। মুকুল যে তার নিজের শরীরকে এতটা অপছন্দ করে, নিজের দেহকে একেবারেই আপন ভাবতে পারে না, সেটা এতো ভালো করে আগে বোঝেনি সে। গায়ে গতরে যতোই বড় হতে থাকে, কেবলি মনে হয় তার, সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যের দেহখাঁচায় বন্দি হয়ে গেছে সে।

এর থেকে বেরুবার, পরিত্রাণ পাবার কোনো উপায় না দেখে অবিরাম ছটফট করে সে। তার বয়স যখন মাত্র নয় দশ, তখন-ই নিজ শরীরের ব্যাপারে অতি তীক্ষ্ণ সচেতনতা ও জোরালো বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয় মুকুলের। অকস্মাৎ তার কিছু শারীরিক পরিবর্তন ও সংযোজন পুরোপুরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তার ওপর। সে এক অবিশ্বাস্য ও অভিনব উন্মোচন। অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। জীবনে সর্বপ্রথম কোনো প্রস্তুতি বা আশঙ্কা ছাড়াই সজোরে চপেটাঘাত হজমের মতো এক ঘটনা।

এর আগে তেমন বড় কোনো ঝুটঝামেলা ছিল না, সামান্য পার্থক্য, একটু ব্যর্থতা, কিছুটা সমঝোতা আর সেই সঙ্গে মাঝেমধ্যে ঈষৎ মনোকষ্ট ছাড়া। কিন্তু হঠাৎ সে লক্ষ্য করে, তার রোগা পাতলা শরীরের অপ্রশস্ত বক্ষের দুই পাশের চামড়া ভেদ করে কিছু একটা যেন উঁকি দিতে চাইছে। ছোট্ট বরুই বিচির মতো। সেই সঙ্গে চিনচিনে সামান্য ব্যথা। বারে বারে সেখানে

হাত চলে যায়। ছুঁয়ে, ছেনে পরীক্ষা করে দেখে মুকুল। প্রতিবার মনে আশা, পরের বার ও দুটোর অস্তিত্ব মিলিয়ে যাবে। হাতের আঙ্গুলের ডগায় আর বাঁধবে না, টের পাবে না কিছু। কিন্তু কার্যত তা ঘটে না। বরং দিনে দিনে তা বাড়তে থাকে ক্যান্সারের মতো । মাকে বলতেই মায়ের চোখেমুখে এক রহস্যময় হাসি দেখতে পায় মুকুল। অভিজ্ঞ মা মুহূর্তেই সামলে নেয় নিজেকে। গম্ভীর মুখে সন্তানকে আশ্বাস দিয়ে বলে, "এসময় এমন হয়। ঘাবড়াবার কিছু নেই। ব্যথা কমে যাবে। সব ঠিক হয়ে আবে। তুই যে বড় হচ্ছিস, মানিক।" সেই বড় হবার পথ ধরে কিছু মেদ-মাংস জমা হতে থাকে মুকুলের লিকলিকে গায়ে। দেখতে দেখতে তার শরীরটা, হাড়-চামড়ার গর্তে বোঝাই কাঠি কাঠি চেহারাটা, ধীরে

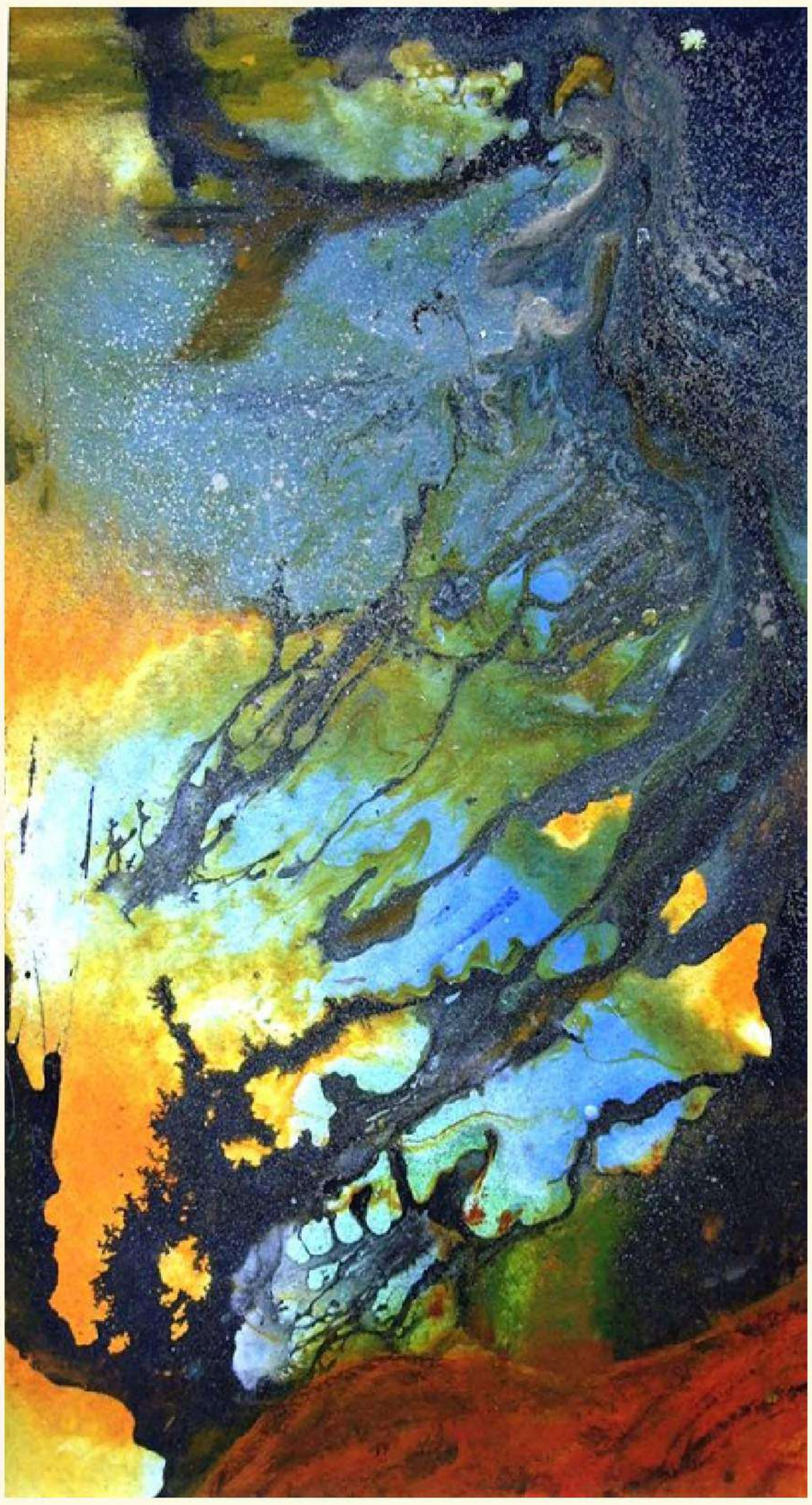

ধীরে কেমন ভরাট হয়ে উঠতে থাকে। কমনীয় লাগে তাকে। আর সেই সময়, বছরে অন্তত দু'বার করে রাজধানীতে এসে মুকুলদের বাসায় উঠত রতন চৌধুরী। অফিসের কাজে, মানে মামলা-মোকদ্দমা করতে কিংবা ব্যাংকের টাকা-পয়সার কাজে। রতন চৌধুরী মুকুলদের দূর সম্পর্কের মামা।

"মামা ঠিক আছে। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে রক্তের কোনো সম্পর্ক কিন্তু নেই আমার।"

কথাটা, বিশেষ করে, মুকুলকে শুনিয়ে শুনিয়ে তার মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিতে চাইত রতন চৌধুরী। মুকুল শুনেছে, তার মায়ের বাবা স্ত্রীকে অর্থাৎ মায়ের মাকে ঘরে রেখেই তার এক সতীনকে এনে তুলেছিল ঘরে। সেই সতীন নারী শুধু বিধবা ছিল না, রতন নামে দশ এগারো বছরের একটা ছেলেও ছিল তার, যাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। সেই লতায় পাতায় আত্মীয় রতন চৌধুরীর কেন যে চোখ পড়েছিল মুকুলের ওপর কে জানে? হয়ত আপন শরীর নিয়ে মুকুল যে যথেষ্ট বিব্রত, সেটা টের পেয়েই এই বাড়তি ও বিকৃত আগ্রহ জন্মেছিল তার। রতন চৌধুরী তাঁদের বাড়িতে এলেই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত মুকুল। পারতপক্ষে তার সামনে যেত না। তাতেও যে শেষ রক্ষা হতো, তা নয়।

আরও কিছুকাল গেলে আরেকটি মারাত্মক উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করে মুকুলের শরীরে। প্রতি মাসের মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট দিনে যখন মুকুলের রক্তক্ষরণ শুরু হয়, তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না সে। তার ভীষণ কান্না পায়। বিনা দোষে কঠিন শাস্তি পাবার মতো ব্যাপার। বয়স তখনো তার বারো পেরোয়নি। সে কোনোমতেই মানতে পারে না এই ক্ষরণ–এই দীর্ঘ প্রস্রবণ, যার ওপর তার কোনো হাত নেই–কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সেই অযাচিত, অনর্থক রক্তপাত, এই গা গুলিয়ে ওঠা পুনঃপুনঃ অসুস্থতা বা অস্বাভাবিক অবস্থা (হ্যাঁ, মুকুলের কাছে ঠিক তাই মনে হতো) থেকে মুক্তি নেই। কিন্তু সে চায় পরিত্রাণ। নিজের শরীরে অবাঞ্ছিত এই প্রক্রিয়ার কারণে বাইরে না গিয়ে প্রতি মাসে চার-পাঁচ দিন লোকচক্ষুর আড়ালে ঘরে লুকিয়ে থাকবে এটা যেমন মানতে পারে না মুকুল, অন্য মেয়েদের মতো প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়ে সব কিছু স্বাভাবিক আছে এমন একটা ভাব করে বাইরে চলাফেরা করাকেও হঠকারিতা মনে হয় তার কাছে। ফলে ক্রমশ এক ভয়ানক ক্রোধ এসে জমা হতে থাকে মনে। নিজের শরীরটা তখন আরও বেশি অচেনা, অজানা ও বিড়ম্বনাময় মনে হয়।

তিন

অন্য কোনো বিকল্প খুঁজে বের করতে না পেরে অবশেষে খবরের কাগজেই বিজ্ঞাপন দেয় মুকুল। সকলের অমতেই। তার পরিবার, মা-বাবা-বড় বোনেরা, প্রচুর বাধা দিতে চেষ্টা করে। অজানা আশঙ্কায়, অমঙ্গলের ভয়ে কাঁপে তাদের মন। কিন্তু মুকুলের কাছে জীবন ধারণ করা আর বেঁচে থাকা, এক কথা নয়। আপন ইচ্ছা অনুযায়ী ভালো করে, নিজে যা অনুভব করে সেই মতো করে, এবং সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বাঁচতে চায় মুকুল। তা যদি সংক্ষিপ্ত-ও হয় তাতেও সে রাজি। সাক্ষাৎকারের ভঙ্গিতে খবরের কাগজে নিজের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করে তার আজন্মলালিত চাওয়ার কথা, স্বপ্নের কথা জানায় সে। ওষুধপথ্যে চিকিৎসা করে অথবা অপারেশনের মাধ্যমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন করে সে তার 'অন্তরের অন্তস্তলে' যেমন বোধ করে সেভাবে-ই নিজেকে দেখতে এবং পেতে চায়। এই জীবদ্দশাতেই। পরীক্ষামূলক কোনো অপারেশনের ভেতর দিয়ে যেতেও আপত্তি নেই তার। নিজের আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় কোনো সহৃদয় ডাক্তার বা সার্জনের সহায়তা প্রার্থনা করেছিল মুকুল। পরে শুনেছে তার এই বেদন বহু জায়গায়, বহু ভাষায় ছাপা হয়েছিল। উত্তর এতটা আশাপ্রদ ও উৎসাহব্যঞ্জক হবে ভাবতে পারেনি সে। সুদূর আমেরিকা ও জাপান থেকেও ডাক এসেছিল বিনা পয়সায় সার্জারি করে দেবার। কিন্তু মুকুল জানে এ ধরনের চিকিৎসায় দীর্ঘ ফলোআপের প্রয়োজন হয়। তার পক্ষে বছর বছর জাপান বা আমেরিকা যাওয়া যেমন সম্ভব নয়, বছরের পর বছর এক নাগাড়ে সেসব জায়গায় গিয়ে থাকাও

অসম্ভব। অনেক ভেবে পার্শ্ববর্তী দেশের অবাঙালি জার্মানফেরত এক তরুণ ডাক্তারের কাছে যাওয়াই ঠিক করে মুকুল। এই ধরনের সার্জারি-ই করেন তিনি। যাবার আগে বাবার একান্ত ইচ্ছায়, সার্জারির পর নার্সিং হোমে রিহ্যাবিলিটিশনের খরচটা পিতার কাছ থেকে নিতে রাজি হয়।

প্রথমে যত বাধাই দিক, শেষ মুহূর্তে তার পরিবারের সকলেই এসে দাঁড়ায় তার পাশে। নবরূপে মুকুলের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন সহজ করে তোলার জন্যে তার গোটা পরিবার তাদের এত বছরের বাসস্থান পাল্টায়, বোনেরা চাকরি বদলায়, বাড়ির ল্যান্ড ও মোবাইল ফোন নম্বর পরিবর্তন করা হয়। পুরনো কাউকে নতুন নম্বর দেওয়া হয় না। তাতে যদি মুকুলের এবং পরিবারের নতুন জীবন কিছুটা হলেও সহনীয় হয়। সার্জারি পুরোপুরি সফল। ডাক্তার তো ভয়ানক খুশি। খুশি মুকুল নিজেও। গত পাঁচ বছর ধরে যে সাকিয়াট্রিস্টের কাছে যাচ্ছে মুকুল, তিনিও নতুন মুকুল্-কে দেখে, কথা বলে, তার মানসিক অবস্থা নিরূপণ করে পরিতৃপ্ত।

এভাবেই কেটে যায় পাঁচ বছর। প্রথম দু বছর তো ঘরে বসে চিকিৎসা করতেই লেগে যায়। কিন্তু তার কিছুদিন পর থেকেই ধীরে ধীরে সবকিছু আর তেমন 'সোনায় সোহাগা' মনে হয় না।

হাসপাতালের কিংবা আপন ঘরের অভ্যন্তরের আরাম ও নিরাপত্তা কি আদৌ দিতে পারে বাইরের অরক্ষিত পৃথিবী- এই হাট খোলা সমাজ! মুকুল পদে পদে ধাক্কা খায়। তার বয়সী যুবকদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে প্রচণ্ড হতাশ হয় মুকুল। দেখে, তারা প্রায় সকলেই নারীসংক্রান্ত ব্যাপারে পুরোপুরি অবসেসড। যৌনপ্রতীক ছাড়া মেয়েদের আর কিছুই যেন ভাবতে পারে না তারা। একটি মেয়ের সঙ্গে সুন্দর করে, ভদ্রভাবে কথা বলার পর মেয়েটি চোখের আড়াল হলেই বা দৃশ্যত কোনো নারীর অনুপস্থিতির সুযোগ পেলেই কয়েকজন যুবক মিলে ভয়ানক অশ্লীল সব মন্তব্য করে মেয়েদের নিয়ে। এ কেবল নারীসঙ্গবিহীন হতাশ যুবকদের খেদোক্তি নয়, মেয়েদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে এমন তরুণদের মনেও মেয়েদের সম্পর্কে এক ধরনের নিচু ও ভুল ধারণার অস্তিত্ব আগাগোড়া সর্বত্র-ই টের পায় মুকুল। সে লক্ষ্য করে, অধিকাংশ লোকের-ই বদ্ধমূল ধারণা, মেয়েদের বুদ্ধিশুদ্ধি, চিন্তা, যুক্তি বলে তেমন কিছুই নেই। শুধু পুরুষদের আনন্দ দেবার জন্যেই তাদের জন্ম। সেই আনন্দদানও মূলত দেহজ। এসব ব্যাপারে কোনো আপত্তি করলে বা বাধা দিতে গেলে নানারকম কটু কথা ও মন্তব্য শুনতে হয়। মুকুল তখন আস্তে সেই স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়।

কোনো আসর বা আড্ডা থেকে মুকুলের এই নিঃশব্দ ও অকস্মাৎ প্রস্থান এত ঘন ঘন হতে থাকে যে, আজ আর তাই কেউ অবাক হয় না হঠাৎ তার উধাও হয়ে যাওয়া টের পেলে। বন্ধুমহলে তার নামই হয়ে গেছে, "এই আছে এই নেই"।

এসবের বাইরে সে আরও কিছু কারণে নিজেকে নিয়ে কিছুটা চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়ে। চারপাশের কিছু কিছু লোক তার সমতল বুক আর মুখের এক গাদা কালো দাঁড়ির বাইরে গিয়ে তার নরম, পেলব হাতপা, আঙ্গুল, হালকা মসৃণ ঠোঁট, হাসি, মসৃন কন্ঠস্বর, কথাবার্তার মধ্যে কোথায় যেন নারীসুলভ গন্ধ পায়। এসব নিয়ে পরোক্ষে তির্যক মন্তব্য করে কেউ কেউ। কেউ আবার যৌন সংকেত বা যৌন ইঙ্গিতও দেয়। বিরক্ত হয়ে আড্ডা থেকে উঠে যায় মুকুল। সেখানে গিয়েও নতুন কিছু খোঁজে। পায় না। বিরক্ত লাগে তখন।

বাড়িতেও কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। আগে এ বাড়ির তিন সন্তান– পিঠাপিঠি তিন কন্যা একটি বড় খাটে এক সঙ্গেই ঘুমাত। এখন মুকুলের জন্যে ভিন্ন সিঙ্গেল খাট পাতা হয়েছে। এক-ই ঘরের দুই পাশে দুটো খাট। অন্য পাশের ডাবল খাটে এখনো একসঙ্গে ঘুমোয় দুই বোন। আগের বাসাতেও ছিল দু'টি বাথরুম। একটা ব্যবহার করত মা-বাবা। অন্যটা বাড়ির তিন সন্তান। দুটো বাথরুম আছে এই বাড়িতেও। কিন্তু একটিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বাবা আর মুকুলের জন্যে। অন্যটা মা ও দুই কন্যা ব্যবহার করে। বাবা কম কথা বলে, ঘরে কম থাকে। বরাবর-ই। আগে মা ও তিন কন্যা বসে অনেকরকম কথা, গল্প করত। এখন বাড়ির মেয়েদের আড্ডায় মুকুলের ডাক পড়ে না। আর বাবাতো আরও কম কথা বলে আজকাল। বিশেষ করে মুকুলের সঙ্গে বলার যেন আর কিছুই নেই তার। সার্জারির পর থেকে ভালো করে মুকুলের দিকে তাকায় না পর্যন্ত বাবা। আরও যেন গম্ভীর ও নিশ্চুপ হয়ে পড়েছে।

সেদিন শুক্রবার। সন্ধ্যায় একটি রেস্টুরেন্ট কাম বারে নিয়ে গেল মুকুলকে তার দুই বন্ধু। গত বুধবার মুকুলের জন্মদিন ছিল। অফিসের কাজের চাপে সেদিন কিছু করতে পারেনি। তাই আজ মুকুলকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে খাওয়াতে চায় ওরা। সবকিছু ঠিকমতোই চলছিল। কিন্তু গোল বাধলো ডিনার শেষে আবার বারে গিয়ে বসার কিছুক্ষণ পরেই। মুকুলের বাম পাশে বসেছিল এক অপরিচিত পুরুষ। বয়স তিরিশের ঘরে হবে হয়তো। মোটা গোঁফ। গাট্টাগোট্টা চেহারা। একা বসে বসে হাইনেকান-এর বোতল থেকে সরাসরি বিয়ার খাচ্ছিল আর মুকুলের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল লোকটা। একসময় মুকুল উঠে পেছনের দিকে বাথরুমে গেলে লোকটাও মুকুলের পিছু পিছু পেছনের দিকে যায়। তারপর সে মুকুলকে পেছন থেকে "হ্যালো" বলে ডেকে থামিয়ে কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়।

"তুমি কি নতুন এই অঞ্চলে? আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।" লোকটি বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী টের পায় মুকুল।

"হ্যাঁ, এখানে এই প্রথম। থাকি শহরের আরেক প্রান্তে। উলটোদিকে।"

বাক্যটা শেষ করে মুকুল অপরিচিতের দিকে তাকাতেই হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই মুকুলের মুখমন্ডলটি নিজের দুই হৃষ্টপুষ্ট হাতের মধ্যে তুলে ধরে সামনের দিকে টেনে তাকে খোলা মুখে চুমু খেতে চেষ্টা করে লোকটা। এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে কিছুটা পিছু হটতেই রাগে-অপমানে রক্তাভ হয়ে ওঠে লোকটির ফরসা মুখ। চোখদু'টো খানিকটা বিস্ফারিত। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে সে। তারপর আবার সামনে এগিয়ে এসে দুই হাতে মুকুলের মাথাটা ধরে বাথরুমের বাইরের দেয়ালে প্রচন্ড জোরে একবার ঠুকে দিয়ে সে সোজা সামনের দিকে হেঁটে চলে যায়। মুকুলের সমস্ত পৃথিবীটা চক্কর দিয়ে ওঠে। এসময় এখানে কেউ নেই। চিৎকার করতে গিয়ে গলা থেকে স্বর বেরোয় না মুকুলের। মনে হয় তার শরীরে কোনো শক্তি যেন অবশিষ্ট নেই। মাথায় প্রচন্ড আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল মুকুল। মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে সে। পারে না। মেঝেতেই আবার শুয়ে পড়ে। জ্ঞান সম্পূর্ণ হারায়নি হয়তো। হয়তো কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়েছিলও। কিন্তু চারদিকের সকল শব্দ যে থেমে গিয়েছিল, সমস্ত আলো নিভে গিয়েছিল, সেটা মুকুল টের পায়। নৈঃশব্দে,

ঠান্ডা মেঝেতে, টয়লেটের বাইরে এক কোণে মরার মতো পড়ে থাকে মুকুল। সে বোঝে মৃত্যুতে কেমন অসাড় হয়ে পড়ে সব বোধ-চেতনা।

কিন্তু মুকুল মরে না। জেগে ওঠে এক সময়। কতক্ষণ পরে কে জানে! সম্বিত ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। আস্তে আস্তে হেঁটে সামনের দিকে এসে দেখে ততক্ষণে খরিদ্দাররা সবাই চলে গেছে। বারের ক্যাশিয়ার বার বন্ধ করার আগে শেষ হিসাব করছে। মুকুল মাথায় হাত দিয়ে টের পায়, মাথার পেছনের ডান দিকটা ফুলে গেছে পিংপং বলের সাইজের একটা গুটুলি পাকিয়ে। রাস্তায় বেরিয়ে আসতে আসতে মুকুল মনে মনে হাসে। এতদিন সে ভাবত এ ধরনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বুঝি শুধু মেয়েদের-ই যেতে হয়। কিন্তু নিজের কথা- বারের আড়ালে আগন্তুকের হাতে নিশ্চুপে এই যৌন আগ্রাসন ও মার খাবার কথা কাউকে বলা যাবে না। শুনলে হাসবে সকলে। মুকুল যাদের সঙ্গে এখানে এসেছিল, তারা চলে গেছে তাকে ছাড়াই। অপেক্ষা করতে করতে হয়তো ভেবেছে, পাগলা মুকুল কে জানে কী কারণে আবার বুঝি রাগ করে আগেই সটকে পড়েছে। সে যে "এই আছে, এই নেই"।

রাত বারোটা বেজে গেছে। বাড়ি থেকে অনেক দূরে শহরের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে মুকুলের হঠাৎ মনে হলো, আজ থেকে কয়েক বছর আগেও তার মা-বাবা শুধু নয়, বড় দুই বোনও সমান ব্যতিব্যস্ত ও চিন্তিত হয়ে পড়ত মুকুলের ঘরে ফিরতে সামান্য দেরি হলে। রাত সাড়ে আট বা নয়টার কাছাকছি হলে তো কথাই নেই। বাবা ছুটতো রিক্সা নিয়ে মেয়ের খোঁজে সম্ভাব্য জায়গার আশেপাশে। বোনেরা টেলিফোন নিয়ে সব জায়গায় ফোন করতে লেগে যেত। মা রাঁধা ডাল পুনরায় জ্বাল দিতে শুরু করত নিজেকে শান্ত ও ব্যস্ত রাখার চেষ্টায়। কিন্তু আজ রাত সাড়ে বারোটা হয়ে গেলেও তাঁদের একজনও তাকে এখনো ফোন করেনি। মুকুলের মুখ ভরা দাড়ি, পরনে গলফ শার্ট-কডোরয়েড প্যান্ট আর পায়ে গাঢ় বাদামি মোজার সঙ্গে সরু লেসে বাঁধা কালো চকচকে চামড়ার জুতো বুঝি তাদের এই নিশ্চয়তা, এই নির্ভয়তা দিয়েছে। মুকুলের নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা আর আগের মতো চিন্তিত নয়। বিশেষ করে বিকেলে তার দুই বন্ধুর সঙ্গে যখন বেরিয়ে এসেছে সে। এদিকটার সব দোকানপাট আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। রিক্সা চলাচলও রাস্তায় সকল যানবাহনই কমে গেছে এখন। বাস চলছে ঘন্টায় হয়ত একটা বা দু'টো। হাড় লিকলিকে একটা বাদামি কুকুর সঙ্গে দু'টি বাচ্চাসহ রাস্তার ওপাশে ডাস্টবিনের চারপাশে শুঁকে শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সম্ভবত খাদ্যের খোঁজে। রেস্টুরেন্টের সামনে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মুকুল ঘরে ফেরার জন্যে বাহনের অপেক্ষা করে। বারবার হাতের সেলুলার ফোনের দিকে তাকায়। কেউ, যে কেউ, যদি ফোন বা টেক্সট করে জানতে চায়, তুমি কোথায়? ঠিক আছো তো? কিন্তু না। কোন ফোন আসে না। কোনো ম্যাসেজও নেই। আজ- এই মুহূর্তে- অন্ধকারে- নির্জন রাস্তার ধারে একা দাঁড়িয়ে ঘরে ফেরার জন্যে রিক্সা কিংবা সিএনজির অপেক্ষা করতে করতে জীবনে প্রথমবারের মতো মুকুলের মনে হঠাৎ প্রশ্ন জাগে, আসলেই কি তার শৈশব, কৈশোর, নবযৌবনকাল সর্বাংশেই অসুখী আর অর্থহীন ছিল?

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

বাঘের আঁচড়

নূর কামরুন নাহার

আয়নায় ঝকঝক করে হাসছে। অদ্ভুত! দু গালে দুটো। চোখের খানিকটা নিচে। গালের উপরিভাগের সন্মুখ থেকে শুরু হয়ে চাঁদের মতো বাঁকা কালো দুটো দাগ। না, দাগ নয় আঁচড়। বাঘের আঁচড়। বাঘের আঁচড় কি সে কখনো দেখেছ? না, সে রকম অভিজ্ঞতা নেই। চিড়িয়াখানায় বন্দি বাঘই দেখেছে আজীবন। আর দেখেছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে। দৌড়ে যাচ্ছে শিকার করেছে। কিন্তু সে ও তো সেলুলয়েডের বাক্সে বন্দি। বনের ভেতর নিজের আবাসে স্বাধীন বাঘ তো সে কোনোদিন দেখেনি। বাঘে খেয়ে ফেলা মানুষও দেখেনি। শুনেছে সুন্দরবন আর বনের আশেপাশের লোকালয়ে বাঘ হামলা দেয়, ধরে নিয়ে যায় মানুষ। আঁচড়ে গভীর ক্ষত করে দেয়। কিন্তু শহুরে মানুষ সে কীভাবে দেখবে স্বাধীন বাঘের রাজকীয় জীবন, জীবন্ত আঁচড়। তবু কেন দাগদুটো দেখেই মনে হলো বাঘের আঁচড়। দাগ দুটো কি আগেই ছিল? কি জানি চোখে তো পড়েনি। মনে হলে রাতারাতি ফুটে বেরিয়েছে। এরকম হবার কথা নয়, নিশ্চয়ই দাগ ছিল, দিনে দিনে বেড়েছে। সে লক্ষ্য করেনি। নিজের যত্নে তাঁর খুব একটা সময় দেওয়া হয় না। কিন্তু এটা কি সম্ভব ক'দিন আগেও যা চোখেই পড়ল না, তাই হঠাৎ এতো দৃশ্যমান হয়ে উঠল।

সুশ্রী, ধারালো, কমনীয় মুখ। দুটো কালো দাগ। গালের কোমল, মোলায়েম ত্বকে ভালো করে স্পর্শ করে সে। না, কোনো ক্ষত শুকিয়ে কালো হয়নি। চামড়ার ভেতর বসে আছে দাগদুটো। কালোর মাঝখানের অংশটুকু সাদা। এত স্পষ্ট এত প্রকট ও বিকটভাবে অস্তিত্বময় যে পুরো মুখে যেন শুধু ও দুটোই দেখা যাচ্ছে। সে কি বেশি ভাবছে? সে জন্যই কি ওগুলো কটকটে হয়ে চোখে পড়ছে। বয়সটা এতো কচি নয় যে দুটো দাগের জন্য তার বিয়ে আটকে যাবে অথবা রং ফরসাকারী ক্রিম মেখে যোগাতে হবে প্রেমিকের মন। তাহলে এতো ভাবছে কেন...দাগদুটোয় ফাউন্ডেশন ঘষে ফেস পাউডার মাখে। হ্যাঁ, কিছুটা সামলানো গেছে।

অফিস কক্ষটা বেশ বড়, আধুনিক, সুসজ্জিত। সে এই দপ্তরের প্রধান। তাঁর অধীনে আছে আঠারো জন। সাতজন অফিসার। এগারোজন কর্মচারী। টানা লম্বা করিডোরের দুপাশে বসে তারা। তাঁর উপস্থিতিতে সবাই দাঁড়িয়ে যায়। মাঝারি হিলের মৃদু খটখট আওয়াজ তুলে সে করিডোর পেরিয়ে আসে। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে আজ্ঞাবহ। দপ্তরকক্ষে প্রবেশ করে এক্সিকিউটিভ রিভল্বিং চেয়ারে বসে। সাইড টেবিলের ওপর ক্রিস্টাল পানির গ্লাস। সুদৃশ্য কাঁচের ঢাকনায় ঢাকা। তিনটা টেলিফোন পাশাপাশি রাখা। টেবিলের ওপরে গ্লাস। ঝকঝকে করে মোছা। সে পানির গ্লাস হাতে তুলে নেয়। ছোট করে একটা চুমুক দেয়।

টেবিলে আসে ধোঁয়া ওঠা চা।

চিনি ছাড়া রং চা। শরীর এখনো যথেষ্ট স্লিম। ডায়াবেটিস নেই। তবু সতর্কতা। চায়ের রং, স্বাদ প্রতিদিনের মতোই। তবু তৃপ্তি পায় না সে। ভেতরে কেমন ছটফটানি। সে এসির হিম বাড়িয়ে দেয়। ধীর চুমুকে চা শেষ করে। নথিগুলো তাঁর স্পর্শের জন্য অপেক্ষমাণ। অফিস কক্ষের মতোই বড় তার ওয়াসরুম। পরিচ্ছন্ন বেসিন, বড় আয়না। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করে দাগদুটো। যথেষ্ট মেকাপ। দাগ ঢাকা পড়ে আছে। কিন্তু মেকাপের আড়ালেও সে দাগ দেখতে পায়। কিছুক্ষণ স্থির তাকিয়ে থাকে আয়নায়। তারপর ফিরে আসে চেয়ারে।

নথিগুলোয় মনোযোগী হয়। অধীনস্থদের ডাকে, পরামর্শ দেয়, পরামর্শ নেয়।

টেবিলের ওপর একটা চিঠি। খামের ওপর নাম, ঠিকানা লেখা। রেহানা আক্তার।

হ্যাঁ, রেহানা আক্তার তাঁর নাম। নানা রেখেছিলেন। হাসননগর গ্রামে নানাবাড়িতে তাঁর জন্ম। মায়ের দ্বিতীয় সন্তান সে। খামটা খুলে চিঠিটা বের করে। কিন্তু পড়ে না। উদ্দেশ্যহীন তাকিয়ে থাকে টেবিলের গ্লাসে। সেখানে ঘোলা প্রতিবিম্ব। ঘোলা বলে দাগ বোঝা যাচ্ছে না। সবসময় খুব স্পষ্ট ভালো নয়। মাঝে মাঝে অস্পষ্টতা প্রয়োজন।

সে কলিং বেল চাপে।

আজ্ঞাবহের বাধ্যমুখ দরজায় দেখা দেয়।

কেউ আসলে এখন ভেতরে ঢোকাবে না।

সে প্রবেশ নিষেধ করল কেন? এটা অফিস। মানুষ প্রয়োজনে আসবে, ঊর্ধ্বতন তাঁকে ডাকবে। সে অধীনস্থদের ডাকবে। নটা-পাঁচটা এই খেলা চলবে। খেলা শব্দটা মনে পড়ায় ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে ওঠে। এই কঠিন কুরুক্ষেত্র কিভাবে খেলা হয়! তবে খেলাই তো। বেঁচে থাকা, লড়াই করা, জিতে নেওয়া, হেরে যাওয়া সবই তো খেলা। জীবনটাই একটা খেলা। সে মাথাটা এলিয়ে দেয় চেয়ারে। দরজা বন্ধ করে সে কি পালাতে চাইছে? কার কাছ থেকে? মানুষের কাছ থেকে না নিজের কাছ থেকে? সে ক্লান্ত, বিক্ষিপ্ত। কিন্তু কেন? আর এই নিরাসক্তি, নিস্তেজতা? মামুলি দুটো দাগ তাঁর মতো শক্ত মনের মেয়েকে এতটা টলিয়ে দিতে পারে! আশ্চর্য নিজেকে চেনারও কত বাকি থাকে মানুষের। না, কোনো দুর্বলতার কাছে আত্মসর্মপণ করা যাবে না। সে সোজা হয়ে বসে। চিঠিটায় চোখ রাখে। রি-রেলিং

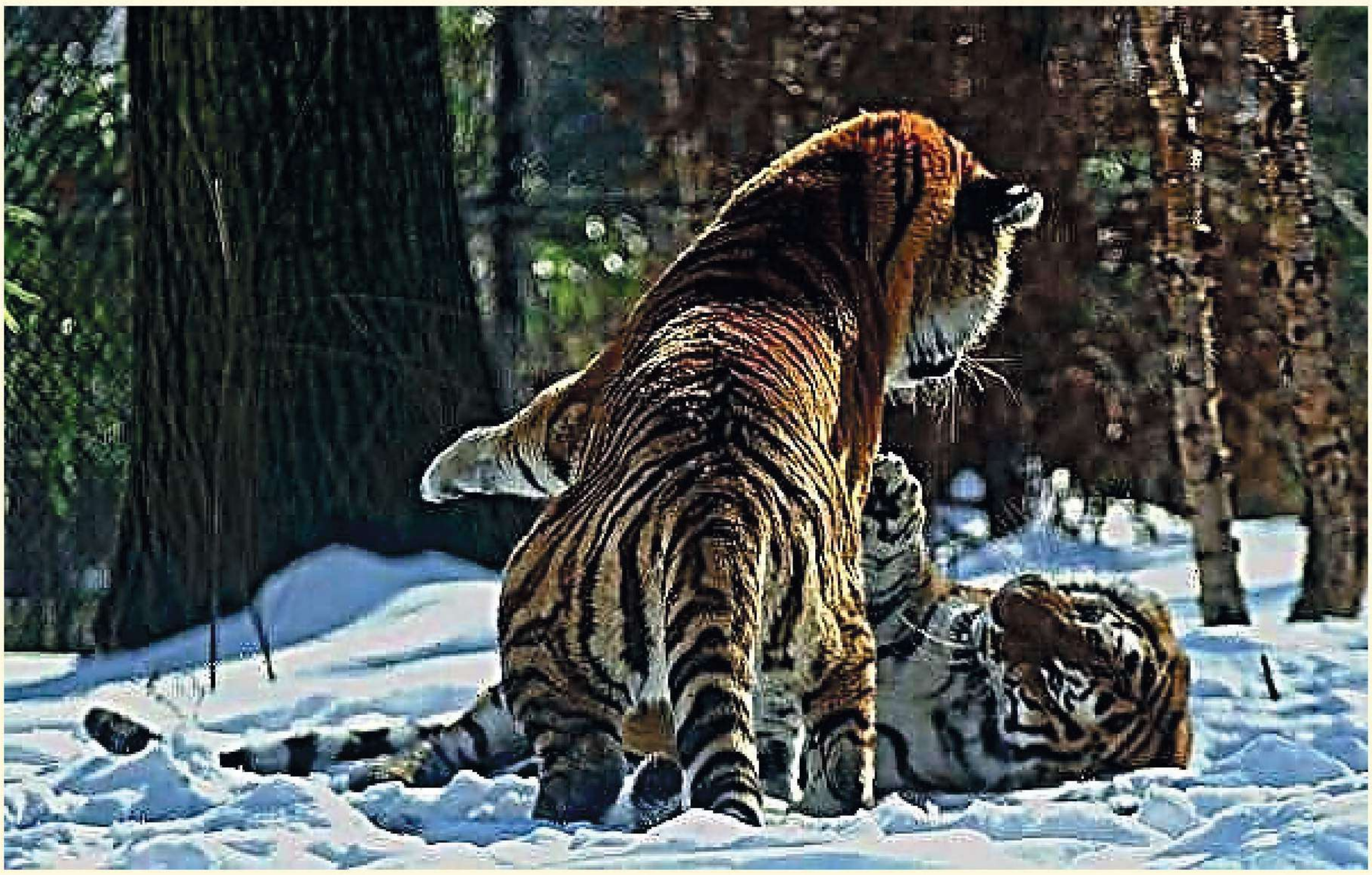

মিলের সঙ্গে এমডির মিটিং। আগামী দিনের শিডিউলে টুকে রাখে। ইচ্ছে করলে এগুলো অধীনস্থদের দিয়ে লেখানো যায় কিন্তু জরুরি বিষয়গুলো সে নখদর্পণে রাখতে চায়। তাঁর ওপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতার জায়গাটা একদিনে তৈরি হয়নি। হাতের টুকিটাকি কাজ গুছিয়ে রেখে আজকের শিডিউল দেখে। ৩.১০-এ মিটিং। মিটিংয়ের কাগজ গুছায়। ৪.০৫-এ মিটিং শেষ হয়। ছোট একটা চিঠি টাইপ করে। বিকাল ৪.২৫। আজকের সব কাজ গোছনো হলো, কোনো কিছু পেইডিং নেই, কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন ভালো করে মন লাগাতে পারেনি। সে একটু ভাবে তারপর স্থির করে, আজই ডাক্তার দেখাবে। তাকে বোধহয় স্কিন স্পেশালিস্ট দেখাতে হবে । অফিসের লেডি ডাক্তারই এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে।

হ্যালো তাব্বাসুম ভালো আছেন?

জি মাডাম। আপনি ভালো?

হ্যাঁ ভালো আছি। আমার একজন স্কিন স্পেশালিস্ট প্রয়োজন। আপনি কি কাউকে রেফার করতে পারেন?

হ্যাঁ মাডাম। রেফার করছি। কিন্তু কাকে দেখাবেন?

আমিই যাব।

আপনি? আপনার স্কিন তো খুব ভালো ম্যাডাম। তাব্বাসুম কলকল করে হাসে। কাউকে স্কিন এর উদাহরণ দিলে আমি আপনার কথা বলি। বলি এই বয়সেও দেখেন ম্যাডামের কি স্কিন!

এ রকম প্রশংসা নতুন নয়। কিন্তু আজ কানে নতুন করে বাজে। মনে হয় তাঁকে কেউ এ ধরনের কথা আর বলবে না। ভেতরটা অস্থিরভাবে মোচড় দেয়। মনে হয় তাঁর সবকিছু হারিয়ে যাচ্ছে। স্কিনের কোমলতা, চেহারার সৌন্দর্য, পেশার দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস সব ডুবে যাচ্ছে। গালের কালো দাগ আর কিছু না, সব কিছু হারানোর কু-ইশারা! সে নিজেকে ধাতস্থ করে। মাত্র দুটো দাগ সব গুঁড়িয়ে দেবে, সে কি এতই দুর্বল?

সে শব্দ করে হাসে। তারপর একটু কোমল কন্ঠে বলে-

না, না কি বলেন। কোথায় আর! বয়স হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো কি আর আছে কিছু!

তাব্বাসুম সুন্দর করে বলে- আপনার বয়স তো একটুও বোঝা যায় না ম্যাডাম। সত্যি আপনি শরীর আর বয়স ধরে রেখেছেন।

তাব্বাসুম ডাক্তার রেফার করে। যোগাযোগের জন্য মোবাইল নম্বর দেয়। চেম্বারের ঠিকানা দেয়।

ইচ্ছে করলে তাব্বাসুমকে ডাক্তারের সিরিয়াল দিতে বলা যেত। কিন্তু সে তা করে না। সে কখনো মানুষের কাছ থেকে বেশি নেয় না। নিজের খাটনিতে পেতে চায়। তাছাড়া মানুষকে সম্মান দেখানোও তার সহজাত বৈশিষ্ট্য।

১৫ নাম্বার সিরিয়াল। সাড়ে পাঁচটা থেকে রোগী দেখেন ডাক্তার। মতিঝিল থেকে ধানমন্ডি যেতে লাগবে কমপক্ষে দেড় ঘণ্টা। না, বেশিক্ষণ বসতে হবে না। যদিও ডাক্তাররা সঠিক সময়ে কখনই রোগী দেখতে আসেন না।

ডাক্তার দুগালের ওপর টর্চের আলো ফেলেন। বেশ কিছুক্ষণ ভালো ভাবে নিরীক্ষা করেন-

আপনার কি মেনোপেজ হয়েছে?

না।

কোনো ইরিগুলারিটি পাচ্ছেন?

না, রেগুলার আছে।

বয়স?

ফরটি নাইন।

ডাক্তার ঝুঁকে কাগজে কিছু লেখেন। তারপর সোজা তাকিয়ে বলে-এমন কিছু না। বয়স হতে থাকলে চামড়ায় কিছু দাগ পড়ে। আর আমাদের ত্বকের দাগের জন্য মেলানিন দায়ী। কোথাও কোনো কারণে ত্বকের কোনো জায়গায় মেলানিন বেড়ে গেলে এ ধরনের দাগের সৃষ্টি হয়। মেনোপেজের সময়ও ত্বকে নানা পরিবর্তন হয়। যাই হোক মেলানিন নিয়ন্ত্রণ-ই হচ্ছে এর আসল চিকিৎসা। রোদে কম যাবেন। রাতের ঘুমও খুব প্রয়োজন। আপনার দাগটা মূলত চোখের কালি থেকে এসেছে।

এটা একবারে চলে যাবে তা নয়। নিয়ন্ত্রণ করে রাখা যাবে। একটা অয়েনমেন্ট লিখে দিচ্ছি, ব্যবহারে আশা করছি চলে যাবে। তবে আবারও দেখা যেতে পারে।
কিন্তু দাগ দুটো হঠাৎ এমন করে ভেসে উঠল।
ডাক্তার একটু হাসে- হঠাৎ হয়নি। আগেও ছিল আপনি হয়তো খেয়াল করেননি। আর এখন হয়তো আপনার ভালো বিশ্রাম হচ্ছে না। তাই একটু বেড়ে গেছে।
সে গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে দুচোখ বন্ধ করে, শহরের রাস্তার এই এত আলো অসহ্য লাগছে। ডাক্তার বলল- দাগদুটো সে খেয়াল করেনি। সেটা কি করে সম্ভব। দিনে অন্তত দশবার আয়না দেখা হয়, নাকি তারও বেশি। দাগ চোখে পড়বে না এটা কি হতে পারে? আজই সকালে আয়নায় ঝকঝক করে উঠল কীভাবে করা আছে। এটা ব্যবহার করলে দাগ হালকা হয়ে যাবে। ডাক্তার বলেছেন-দাগটা কখনো পুরোপুরি যাবে না। বাঘের আঁচড় কি কখনো যায়? সে ভাবে, তাঁর চেয়ার আছে, সে দপ্তর প্রধান। তাঁর দুটো সন্তান আছে। মেধাবী। সে একটা ফ্ল্যাটের মালিক। তবু দুটো দাগ সারাদিন তাঁকে অধিকার করে রাখল। সে বিক্ষিপ্ত! বির্পযস্ত! শুধু দুটো দাগ! স্পষ্ট শুনতে পায় মায়ের কণ্ঠ- তোরে বাঘে আচঁড় দিছে? তোরে নষ্ট করে দিছে। নষ্ট মেয়ে।

'নষ্ট মেয়ে' শব্দটা বোঝার বয়সও তখন হয়নি, তবু ঐ শব্দ বুকের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কত ছিল বয়স? মাত্র এগারো বছর। তবু সব ছবির মতো স্পষ্ট, সেই দুপুর, মায়ের ভীষণ চেহারা। ভীরু ভীরু কণ্ঠে মাকে বলা। মায়ের অগ্নিমূর্তির সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা অপরাধী বালিকা।

সে তখন ক্লাস ফাইভের ছাত্রী। বালিকা বয়স থেকে কিশোরী হয়ে ওঠার প্রথম ধাপ। বড় বোনের সঙ্গে তার বয়সের ব্যবধান বারো বছর। বোনের বিয়ে হয়েছে। দুলাভাই সরকারি কর্মকর্তা। বরিশাল পোস্টিং। বাবাও সেসময় হঠাৎ বদলি হয়েছেন রংপুর। বোন সন্তানসম্ভবা। ডেলিভারির সময় মা গেলেন বরিশাল। নদীর পথ, দূরের রাস্তা মা তাকে নিলেন না, রেখে গেলেন বড় খালার বাসায়। খালার বাসা যাত্রাবাড়ী। যাত্রাবাড়ী তখন বেশ ফাঁকা গ্রাম এলাকার মতো। খালার সেমিপাকা বাড়ি চারপাশে দেয়াল ওপরে টিনের চাল, বেশ কয়েকটা রুম, বড় উঠান। উঠানে পেয়ারা, নারিকেল, আমগাছসহ নানা ফুলের গাছ। এত বড় বাড়িতে খালা-খালু আর খালাতো ভাই থাকেন। ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। বোনদের বিয়ে হয়েছে। এমনিতে সে বেশ শান্ত। কিন্তু এ বাড়িতে এসে সে একটা চড়ুই পাখি হয়ে যায়। বড় উঠান, চারপাশে খোলা মাঠ আর পাশের বাড়ির আমেনা, মিনা এদের পেয়ে সারাদিন শুধু আনন্দ আর খেলা। মায়ের বকুনি নেই, স্কুল নেই, পড়া নেই। বোনঝি বেড়াতে এসেছে। খালা একটু বেশিই আদর করছেন।
সে সময় এক দুপুরে ভাত খাবার পর খালাতো ভাই তাকে ডেকে নিয়ে যায়। বিছানার ওপর শুয়ে সে গল্প করে। ভাই কবিতা শুনতে চায়, সে কবিতা শোনায়। ভাই একটা গল্প বলতে থাকে। শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর আবার যখন জাগে সে দেখে তার ওপর উপুড় হয়ে আছে খালাতো ভাই। কী হচ্ছে কেন হচ্ছে কিছু বোঝে না সে, ঘুম চোখে প্রশ্ন করে- তারিক ভাই কী হয়েছে?
হতচকিত ভাবে সরে যায় ভাই- না, না কিছু না। তুমি ঘুমাও।
ঘুম তখন পুরোটা ভেঙে গেছে। সে উঠে বসে। দেখে তার হাফপ্যান্টটা খোলা।
প্রবল লজ্জা তাকে বিমূঢ় আর বিবস করে দেয়। তারিক ভাই দ্রুত হাতে তাঁকে প্যান্ট পরিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সেও ঘর থেকে কীভাবে বের হয়ে এসেছিল মনে পড়ে না। তারিকভাই তাঁকে কী করেছে তাও বুঝতে পারে না। শুধু মনে হয় খুব লজ্জার, খুব খারাপ কিছ। সে অনুভব করে নাভির নিচে কোথাও জ্বলছে। বিকেলে সে খেলতে যায় না। সন্ধ্যায় শুয়ে পড়ে। বিছানায় শুয়ে চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে। নিজেকে খুব অপমানিত মনে হয়। রাতে সে খায় না। দাগটা সে দেখতে পায় পরদিন। নাভির নিচ থেকে বাঁকা হয়ে থাকা একটা নখের আচড়। ফুলে লাল হয়ে আছে। দুদিন পর মা এসে তাঁকে বাসায় নিয়ে যায়। ঐ দুদিন সে কারও সঙ্গেই ভালো করে কথা বলতে পারেনি। মনে হয়েছে কে যেন তার চড়ুই পাখির ডানাটা ভেঙে দিয়েছে।
বুকটা তাঁর ভার হয়ে ছিল। মায়ের কাছে সে ছিল এক স্বচ্ছ বালিকা। মাকে এই ঘটনা না বলে সে থাকতে পারেনি। মাকে সে খুব পছন্দ করে। মা লেখাপড়া জানা মানুষ। পাড়ার সবাই তাকে সমীহ করে। তাঁর ছোটমন বলেছিল মাকে বললে সে এই লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। দুপুরে মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে সে বলেছিল সেই লজ্জার কথাটা। পুরোটা সে বলতে পারেনি। তার আগেই মা তাঁকে বুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে। গালে জোরে চড় মেরে বলে-নটি মেয়ে তুই ওর ঘরে গেলি কেন?
মায়ের মুখে এই 'নটি' শব্দ সে আর কখনো শুনেনি। মায়ের এই চেহারাও কখনো দেখেনি। 'নটি' শব্দটা পাড়ার মহিলাদের ঝগড়ার সময় শুনেছে, সে জানে এটা একটা খারাপ শব্দ। এই শব্দ যে মা কখনো বলতে পারে এটি ছিল তাঁর ধারণার অতীত। সে পাথর হয়ে বিছানায় বসে থাকে।
পরের ঘটনা ছিল আরও ভয়াবহ। মা তার জড়বৎ শরীরটাকে একপ্রকার টেনে খাট থেকে নামিয়ে এনেছিল। তারপর তীব্র কন্ঠে বলেছিল- তুই নষ্ট হয়ে গেছিস। নষ্ট মেয়ে। খোল তোর প্যান্ট। আমি তোর ঐ জায়গা দেখব। কী করেছে ঐ হারামজাদা।

সেই নির্জন দুপুরে লজ্জায়, কষ্টে, শোকে সে একবারে কুকঁড়ে গিয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল সে একটা কেঁচো। মাথা নিচু করে সে দাঁড়িয়ে ছিল মায়ের সামনে। একটানে মা প্যান্ট খুলে ফেলেছিল। নাভির নিচের সেই আচঁড়টা তখন কালো হয়ে আছে। সেটা দেখে মা দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল-নষ্ট করেছে তোকে, নষ্ট। তোরে বাঘে আঁচড় দিছে। তারপর ডুকরে কেঁদে বলেছিল-আমার দুধের মেয়েরে বাঘে কামড় দিছে। মা তাকে গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখছিল। সে দুচোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল। মায়ের ফুঁপানো কান্নার শব্দ তার দু'কানের পর্দা কেটে ভেতরে প্রবেশ করছিল। তার মনে হচ্ছিল এই চোখ সে আর কোনোদিন খুলবে না। সে আর কোনেদিন এই পৃথিবীর মুখ দেখবে না।

তারপর সে কেমন করে তাঁর নগ্নতা ঢেকে ফিরে গিয়েছিল বিছানায় তা আর মনে পড়ে না। শুধু চরম অপমানের সেই দুপুর মিশে গিয়েছিল তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে। সে দিন তাঁর মনে এক নির্বোধ প্রশ্ন জেগেছিল। কোনো রকম অন্যায় না থাকা সত্ত্বেও কেন মা তাঁকেই মেরেছিল। কেন মা নটি বলেছিল। নষ্ট বলেছিল। সেদিন সেই নির্বোধ প্রশ্নের কোনো উত্তর না পেলেও আজ এই ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে এই প্রশ্নের উত্তর সে জানে। তাঁর মেয়ের বয়সও এখন চব্বিশ।

আটত্রিশ বছর পর তাঁর গালে ফুটে উঠেছে বাঘের আঁচড়। যে আঁচড় সে বন্দি করে রেখেছে একটা ভ্যাপসা গরম, নির্জন দুপুরে।

ছোট একটা ঝাঁকুনিতে ঘোর কাটে। সে চোখ খোলে। নিজেকে সে ফিরে পেতে চায়। শহরের রাস্তার বাতি, ছুটে চলা মানুষ, গাড়ির লাইট দেখে। গাড়ি থামায়, অয়েনমেন্ট কেনে।

সাতদিনেই দাগ দুটো বেশ হালকা হয়ে গেছে। সে নিজেও একটু হালকা বোধ করে। দাগ দুটো নিয়ে এত ভাবনা ঠিক হয়নি। দুটো দাগে কেন খুঁচিয়ে তুলতে হবে চাপা দেওয়া অতীত, কষ্টের নিশ্বাস! না এভাবে কোনো কিছু রিলেট করা ঠিক না। তাকে আরও শক্ত হতে হবে। কয়েকটা দিন ভেতরটা অস্থির হয়ে আছে। আজ নিজেকে সে সাজায়। রাজশাহীর কাজ করা সিল্ক শাড়িটা পরে। ম্যাচিং করে ব্রেসলেট পরে। আয়নায় খুঁটিয়ে নিজেকে দেখে। না, কোথাও কিছু হারিয়ে যাচ্ছে না।

মিটিংয়ে ভালো পারফরমেন্স রাখে। মানুষের বড় সম্পদ হলো আত্মবিশ্বাস। হেমন্তের এই সময়টা খুব সুন্দর, না ঠান্ডা, না গরমের এক স্বস্তিকর আবহাওয়া।

দরজায় তাব্বাসুমের মুখ দেখা যায়- ম্যাডাম আসব।

অবশ্যই।

তাব্বাসুম উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলে, উহ্ ম্যাডাম আপনাকে যা লাগছে।

জুনিয়র সহকর্মীদের সঙ্গে সে খুব গম্ভীর নয়, বরং প্রাণখুলে কথা বলে। তার ব্যক্তিত্ব আছে ওটাই সীমারেখা টেনে রাখে।

থ্যাংকস।

দুদিন আগেই আসব ভেবেছিলাম। ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। সেদিনই গিয়েছিলাম।

দাগটা দেখি ম্যাডাম। তাব্বাসুম একটু ঝুঁকে তাকায়।

কই খুব বেশি বোঝা যাচ্ছে না তো।

একটা অয়েনমেন্ট দিচ্ছি। কিছুটা হালকা হয়ে গেছে। আর মেকাপ তো আছেই।

তাব্বাসুমও হাসে- না, ম্যাডাম তা না। আপনি বোধহয় শুধু শুধুই চিন্তা করেছেন। এটা তেমন কিছু না। আমারও কিন্তু এমন একটা দাগ আছে, এই যে দেখুন-

চোখের নিচের দিকটায় আঙ্গুল রাখে তাব্বাসুম। চিকন রেখার একটা বাঁকানো দাগ।

অনেক দিন ধরেই মেডিসিন ব্যবহার করছি। এখন কিছুটা হালকা হয়েছে।

তোমাকে চা দেব?

হ্যাঁ, খাওয়া যায়।

তাব্বাসুম চা খেতে থাকে। গল্প করে। আশ্চর্য গল্পে তার মন বসে না। সে দেখতে থাকে তাব্বাসুমের সেই অস্পষ্ট চিকন রেখার দাগ। হ্যাঁ, ঠিক সেই বাঘের আঁচড়। সে নিজের প্রতি বিরক্ত হয়। এটা কি কোনো মনোবিকার? সে ভাবে শাহনাজ এসেছে কানাডা থেকে এখনো দেখা হয়নি। শুক্রবার ওকে দাওয়াত দেবে। মন অন্যদিকে ফেরাতে হবে।

বন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর পর দেখা। সাদা চামড়ার দেশে থাকে শাহনাজ। ও নিজেও বেশ ফরসা। সুন্দর করে সেজেছে শাহনাজ। শরীরটাকে এখনো চমৎকারভাবে ধরে রেখেছে। সে বন্ধুকে আলিঙ্গন করে। ভালো করে দেখে বন্ধুর মুখ। ভীষণ চমকে ওঠে সে। শাহনাজের পুরু মেকাপের নিচে সেই দাগ।

একি শাহনাজ তোর মুখেও বাঘের আঁচড়?

বাঘের আঁচড়?

সে খুবই বিব্রত বোধ করে। মুখ ফসকে এ ধরনের কথা বলা একদম ঠিক হয়নি।

তোর মুখের দাগের কথা বলছি।

হা হা করে হাসে শাহনাজ- তাই বল। আমি তো ভয় পেয়েছি। তা ভালো বলেছিস। ওটা আসলেই বাঘের আঁচড়। এত কিছু করছি যাচ্ছে না।

এত উন্নত দেশে থাকিস। ওখানের এতো ভালো মেডিসিন।

না, হচ্ছে না কিছুই। ঠান্ডার দেশে স্কিন ভালো থাকে নারে।

না, সেজন্য না। বয়েস হলে চামড়ায় কিছু দাগ আসে। আর কালো দাগের জন্য দায়ী হচ্ছে মেলানোসাইট। সান বার্নে এটা আরও গাঢ় হয়। মেনোপজের সময়ও চামড়ার কিছু পরিবর্তন হয়। শাহনাজ হো হো করে হাসে- তুই দেখি আগের মতোই পন্ডিত আছিস। সেও বান্ধবীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসে-এগুলো আমার কথা না ডাক্তারের কথা। আমারও তোর মতোই এমন দাগ হয়েছে। একটা অয়েনমেন্ট মাখছি। তুইও দেখতে পারিস।

বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগে। কত ঠুনকো কথা। এইসব কথা, গল্পও জীবনের জন্য কত জরুরি। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে ওরা শাড়ির দোকানে যায়। শাহনাজকে ওর পছন্দের একটা শাড়ি কিনে দেবে। নামকরা ফ্যাশন হাউজের দোকান। তার দীর্ঘদিনের পরিচিত। পাতলা মতন একজন মহিলাই দোকানটা দেখেন। তাকে দেখে হাসি মুখে এগিয়ে আসেন। এই ভদ্রমহিলাকে সে বহুবার দেখেছে। তাঁর রুক্ষ, শুষ্ক চেহারা, ছোট শুকনো শরীরটা খুবই পরিচিত। কিন্তু আজ সে চমকে ওঠে। মহিলার কপালে ছোপ ছোপ দাগ। ঠিক বাঘের শরীর। সে স্মৃতি হাতড়ায়। এই মহিলার কপালে কি সে আগেও দাগ দেখেছে? হ্যাঁ, দেখেছে। কিন্তু স্পষ্ট মনে পড়ে সেগুলো বাঘের শরীরের মতো ছিল না। এখন দাগগুলো বাঘের শরীরে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর তাকিয়ে থাকতে অস্বস্তি হয়।

হেমন্তের হলুদ বিকেল। বন্ধুর সঙ্গে কাটানো দুপুর, কেনাকাটা সব কিছুই খুব চমৎকার। এখন এই হলুদ বিকেল দেখে দেখে বাসায় ফেরাটাও খুব ভালো লাগছে। সে শহর দেখে বিকেল দেখে, মানুষ দেখে, নারী, পুরুষ, শিশু দেখে। মানুষের ঢল নেমেছে এই ছুটির বিকেলে। নগরীর মানুষেরা কেউ হাসছে, কথা বলছে, কেউ ছুটছে। সুসজ্জিত নারী-পুরুষে বর্ণিল হয়ে আছে রাজপথ। কিন্তু আশ্চর্য! উজ্জ্বল, শোভন নারীদের চেহারায় বাঘের আঁচড় কেন? সে তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। সে নিজেকে শাসায়, কোথাও কোনো বাঘের আঁচড় নেই। কিন্তু না, তাঁর চোখ দেখতেই থাকে অগণিত নারী, অগণিত নারীর গায়ে, মুখে ফুটে ওঠা বাঘের আঁচড়। সে দেখতে থাকে কাপড়ে আড়াল করা, মেকাপে ঢাকা বাঘের আঁচড়। নেশার মতো সে দেখতে থাকে দৃশ্যমান আর অদৃশ্য আঁচড়। কালো দাগগুলো এই হলুদ বিকেলের গায়ে লেগে যায়। চোখের সামনে তার প্রিয় নগরী কালো আর হলুদের ডোরাকাটা বাঘ হয়ে যায়।

প্রবন্ধ

ভিয়েতনামের নির্বাসিত কবি ও শান্তিকর্মী থিক ন্যাট হানের দর্শন ও কবিতা

উপালি শ্রমণ

প্রবাস জীবনে নিজ দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি অংশগ্রহণ করা না গেলেও, বিদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় হওয়া এবং বিদেশি কবি ও লেখকের সঙ্গে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ভাবেই সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। এ ধরনের আকস্মিক অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের জীবনে স্মৃতির ভাণ্ডারে দুর্লভ সঞ্চয় হয়ে অনুপ্রাণিত করে দীর্ঘকাল। আমার জীবনে সেরকম একটি ঘটনা হচ্ছে ২০১৪ সালে ভিয়েতনামের কবি ও আধ্যাত্মিক গুরু থিক ন্যাট হানের (Thich Nhat Hanh) একটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ। সম্প্রতি (জানুয়ারি ২২, ২০২২) তিনি ৯৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাই পাঠকদের কাছে এই মনীষীর জীবন দর্শন এবং কবিতা নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করতে চাই।

একটু পেছন থেকেই শুরু করি। আমি বোস্টনে এসেছিলাম ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে। তাঁর আগে এপ্রিল মাসে বিখ্যাত বোস্টন ম্যারাথনে একটি ভয়ানক সন্ত্রাসী হামলা হয়। আমি যখন বোস্টন আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আমার কল্যাণকামী অনেকেই স্বভাবতই কিছুটা শঙ্কিত ছিলেন। এই দুর্ঘটনার ঠিক এক বছর পর থিক ন্যাট হান আমেরিকায় বক্তৃতা ট্যুরে আসেন এবং তাকে নিয়ে বোস্টনেও কিছু প্রোগ্রামের আয়োজন হয়। তাঁর একটি ছিল সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ও আহতদের জন্য সংহতি প্রকাশ এবং বিশ্ব শান্তির জন্য প্রার্থনার আয়োজন। আমি যেই প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিলাম সেখানে দুই হাজারেরও বেশি মানুষ সম্মিলিত হয়। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এত লোক কোনো শব্দ না করে কপ্লে স্কয়ারে ধ্যানরত ছিলেন দেখে আমি অবাক হয়ে যাই এবং থিক ন্যাট হানের ব্যক্তিত্বের প্রতি মুগ্ধ হয়ে যাই। এই ধ্যানের পর অবশ্যই তাঁর শিষ্যরা শান্তির প্রার্থনা করে কিছুক্ষণ সংগীতও পরিবেশন করেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে একই মঞ্চে বসার স্মৃতি কখনো ভুলবার নয়।

থিক ন্যাট হান সম্পর্কে আমি আগে যৎকিঞ্চিত জানলেও তাঁর কোনো লেখা তেমন গভীরভাবে পড়া হয়নি। এই অভিজ্ঞতার পর তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে জানার জন্য আমার আগ্রহ বেড়ে যায়। আমি জানতে পারি সেই কিশোর বয়স থেকেই তিনি মানবতার কাজে জড়িত আছেন। ষাটের দশকে উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে গুরুতর যুদ্ধ চলাকালে থিক ন্যাট হান তার সহচারীদের সঙ্গে নেমে পড়েন শরণার্থীদের সেবায়। যুদ্ধের ভয়াবহ সব অভিজ্ঞতা, পত্রিকায় প্রকাশিত খবর এবং শরণার্থীদের হৃদয়বিদারক কাহিনীগুলো থিক ন্যাট হানের হাতে কবিতার রূপ নেয়। "তিরস্কার"(Condemnation) নামে একটি কবিতায় তিনি লেখেন- "যারা শুনছেন, তারা আমার সাক্ষী হয়ে থাকবেন/এই যুদ্ধ আমি মানতে পারছি না/কখনো পারিনি, কখনো পারবো না।/আমাকে হত্যা করার আগে আমি সহস্রবার এই কথা বলবো।/আমি সেই পাখির মতো যে তাঁর সঙ্গীর জন্য প্রাণ দেয়/বিচূর্ণ চঞ্চু থেকে রক্ত পড়তে পড়তে সে চিৎকার করে বলে/"সাবধান হও! ফিরে দেখো তোমাদের প্রকৃত শত্রুকে-/উচ্চাভিলাষ, হিংসা, ঘৃণা, এবং অদম্য লোভ।" এই কবিতার পর তিনি যুদ্ধবিরোধী কবি হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর সে সময়ের কবিতাগুলোর মধ্যে প্রকাশিত হয় মানবতার জন্য হৃদয়ের আকুল আর্তি। যুদ্ধের এমন দুঃসময়ে "শান্তি" শব্দটি উচ্চারণ করাই নাকি ছিল অপরাধ, কারণ এই শব্দ উচ্চারণকারীকে তাৎক্ষনিকভাবে কম্যুনিস্ট, কম্যুনিস্ট সমর্থক বা পরাজয়ের মনোভাব সম্পন্ন বলে বিবেচনা করা হতো। আধ্যাত্মিক জীবনচর্চার পাশাপাশি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ধর্মীয় গুরুদের সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

১৯৬৬ সালে তিনি ভিয়েতনাম-যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য এবং শান্তি চুক্তির দাবি নিয়ে জনমত গঠন করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। এর ফলে তিনি নির্বাসিত ঘোষিত হন ভিয়েতনামের উভয় অংশ থেকেই। সে সময় নোবেল বিজয়ী মানব অধিকার কর্মী মারটিন লুথার কিং জুনিয়রের সঙ্গেও তিনি একাধিকবার সাক্ষাৎ করেন। মারটিন লুথার কিং ১৯৬৭ সালে তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য নমনিত করে চিঠিতে লেখেন, "থিক ন্যাট হান হচ্ছেন একজন শান্ত ও অহিংসার উত্তম প্রবক্তা"। অবশ্যই সে বছর

নোবেল শান্তি পুরস্কার কাউকেই দেওয়া হয়নি। পশ্চিমা দেশগুলোতে এই কবি একজন মানবতাবাদী, শান্তিকর্মী, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রবক্তা এবং ধ্যান পদ্ধতির প্রশিক্ষক হিসেবেই অধিক পরিচিত। এ সকল বিষয়ে তিনি পঞ্চাশের অধিক গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর গদ্যগ্রন্থও কবিতার ভাষায় এবং ভাবে মণ্ডিত। তিনি অধ্যাপনাও করেছেন কর্নেল ও কলাম্বিয়াসহ বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি একজন চিত্রশিল্পীও বটে, এঁকেছেন দৃষ্টিনন্দন অনেক ক্যালিগ্র্যাফি। ভিয়েতনামের প্রাচীন লোককথা অবলম্বন করে লিখেছেন একটি উপন্যাসও। ১৯৮২ সালে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাঁর "প্লুম ভিলেজ" নামের ধ্যান কেন্দ্রের শাখা ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র বিশ্বে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত শিষ্য, অনুসারী, ও অনুরাগী রয়েছে অসংখ্য। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, থিক ন্যাট হানের প্রতিষ্ঠিত ধ্যান কেন্দ্রগুলোতে ভিয়েতনামের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রাক্তন মার্কিন সেনাও তাঁর কাছে ধ্যান এবং শান্তির দীক্ষা নেন।

থিক ন্যাট হানের রচনায়, প্রতিষ্ঠানে এবং ধ্যান শিক্ষায় সবচেয়ে মুখ্য হচ্ছে মানুষে মানুষে এবং মানুষ ও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য যে সম্পর্ক সেটি প্রকট করার তাড়না। সহজভাবে বলা যায়- আমরা যেহেতু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবাই সবার ওপর, সর্বোপরি প্রকৃতির ওপর, নির্ভরশীল আমাদের একে অপরের ভালোর এবং মন্দের দায়ভারও রয়েছে সবার। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিত্য সমুৎপাদ বা কার্য-কারণ নীতির (theory of interdependence) তত্ত্ব ও শূন্যতাবাদকে তিনি ব্যক্ত করার জন্য ইংরেজি ভাষায় সৃষ্টি করেন একটি নতুন শব্দ interbeing, যেটি অক্সফোর্ড অভিধানেও সংযোজিত হয়। এই শব্দের মাধ্যমে এটাই বোঝান যে, মানুষ বা কোনো কিছুই স্বয়ংজাত বা স্বয়ম্ভূ নয়। প্রত্যেক বস্তু ও জীবের সঙ্গে রয়েছে অন্য অনেক উপাদান। এই ধারণাটি সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে তিনি বলেন- একজন কবি একটি খাতার সাদা পাতায় সূর্য ও মেঘ দেখতে পায়। তার সঙ্গে বৃষ্টির জল, একজন কৃষকের ঘামের ফোটা, অসংখ্য লোক যারা একটি বাঁশ বা বৃক্ষকে বইয়ের পাতায় রূপান্তর করতে সাহায্য করেছে এই সব সুস্পষ্টভাবে সে দেখতে পায় একটি সাদা পাতায়। এই বিষয়ে সচেতন হলে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে বেরিয়ে সমষ্টিগত চিন্তা করতে অভ্যস্ত হবে। তাদের আচরণও বিনীত হবে। Interbeing এর এই ধারণা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতায় এবং সকল কর্মে।

তাঁর কবিতা সম্পর্কে মার্কিন কবি রবার্ট ক্রিলি বলেন "অত্যন্ত সরল এবং চির স্বচ্ছ এই কবিতাগুলো এক দিনের বা এক হাজার বছরের সত্যকে একসঙ্গে একই মুহূর্তে ফুটিয়ে তোলে। আমরা সময়ের হিসাব করতে ভুলে যাই। শুধু জানি কবি এখানে আছেন এবং এই শব্দগুলিই আমাদেরকে তাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে।" প্রসিদ্ধ লেখক নাতালি গোল্ডবার্গ বলেন, "কবিতাগুলো আপনার ভেতর প্রবেশ করে- মস্তিষ্কের মাধ্যমে নয়, হৃদয়ের মাধ্যমে। আমি যখন এগুলো পড়ি আমার মনে হয় আমি এক আলো দ্বারা স্নাত হচ্ছি। একেবারে অস্থিমজ্জার মতো সরল কবিতাগুলো শান্তির বার্তাই প্রকট করে।" মানুষের উপর অগাধ বিশ্বাস এবং গভীর সহানুভূতি থিক ন্যাট হানের কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। তাই সমাজে একেবারে ক্ষমার অযোগ্য যাকে ধরা হয় তাঁকেও তিনি আলিঙ্গন করতে দ্বিধা করেন না। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন সব মানুষের পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে এবং সবার নিজেকে আরো উন্নত করবার জন্য সুযোগ পাওয়া উচিত। সেই উপযুক্ত পরিবেশ গড়াই আমাদের কর্তব্য।

আর তাই ক্লাউড থমাসের (At Hell's Gate এর লেখক) মতো যে মার্কিন সৈন্যরা ভিয়েতনামে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল তাদেরকেও তিনি ঘৃণা করেননি, বরং যুদ্ধের পর তাঁর ধ্যানকেন্দ্রে আশ্রয় দিয়েছেন। এমন মহানুভব এবং উদারতা সম্পন্ন ব্যক্তি দীর্ঘ ৪০ বছর নির্বাসিত থাকার পর ২০০৫ সালে প্রথম ভিয়েতনামে ফিরে গিয়ে ভ্রমণের এবং শিক্ষা দেওয়ার এবং ২০১৪ সাল থেকে স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি প্রাপ্ত হন। থিক ন্যাট হানের জীবন ও কবিতা যেন বিশ্ব-মৈত্রীরই মূর্ত-প্রকাশ। তাঁর দর্শন প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা "Call me by my true names"-এর মধ্যে। এই মনীষীর মহাপ্রয়াণে এখানে তাঁর এই বিখ্যাত কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করলাম।

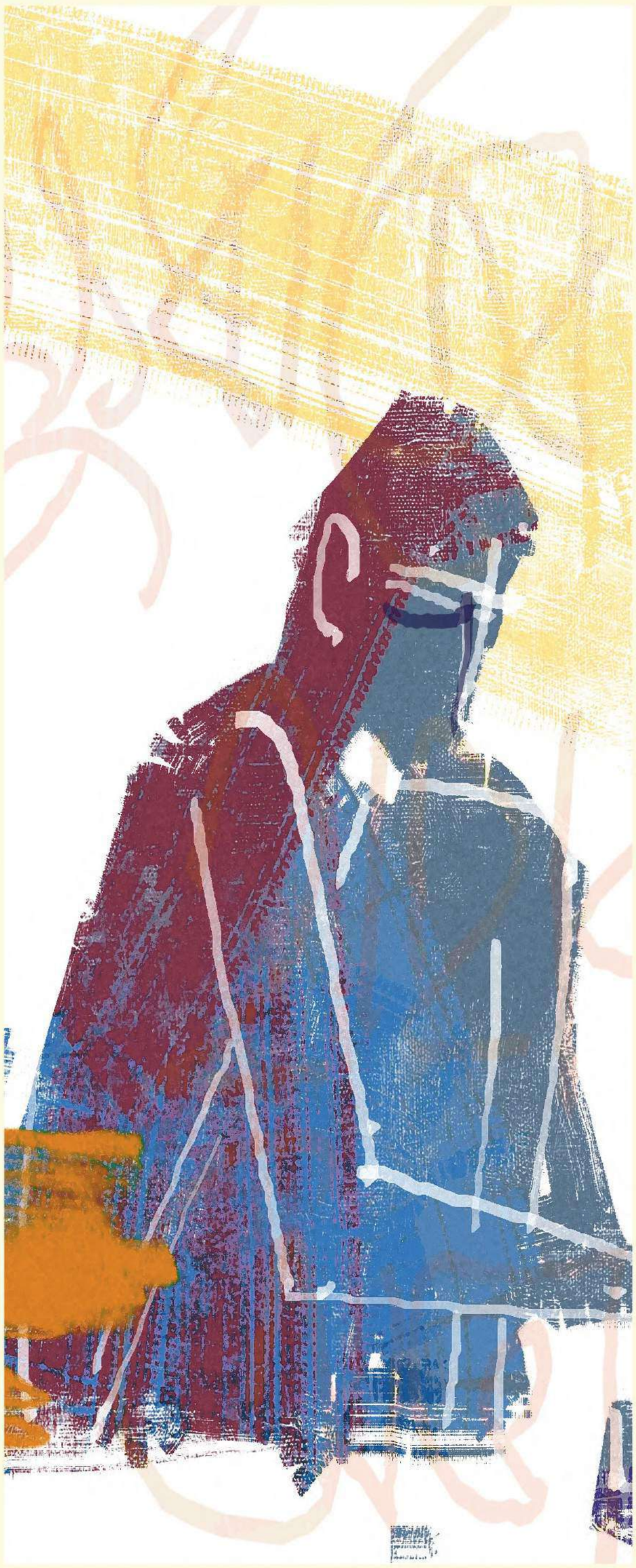

আমাকে আমার সত্য নামেই ডেকো

আমি যে কাল চলে যাব– সে কথাটি কেন বলো?
আজও আমি আসছি,
ভালো করে চেয়ে দেখো–
প্রতিটি ক্ষণ আমি আসছি
বসন্তের ওই গাছের শাখায় ফুলের কলি হয়ে,
আমি আসছি–
ছোট্ট একটি পাখির ছানা হয়ে,
এখনো যার কোমল দুটি ডানা
উড়তে শিখছে ধীরে,
কিচমিচ সুরে গাইতে শিখছি আমার নতুন গানও।
এখনও তো আমি আসছি–
একটি ফুলের কোলে ছোট শুঁয়োপোকা হয়ে।
আমি আসছি–
পাথরের ওই বুকের মাঝে উজ্জ্বল মণি হয়ে।
আসছি আমি প্রাণটি খুলে হাসবো বলে, কাঁদবো বলে,
ভীত হয়ে, আশায় আবার বুক ভাসাবো বলে।
হৃদয়ের এই ছন্দে আমার জীবন্ত সব প্রাণের শব্দ বাজে,
তাদের মৃত্যুর শব্দ পাবে আমার মাঝে।
ফড়িং আমি আমার বদল হচ্ছে নদীর তীরে
যেই পাখিটি হঠাৎ এসে ফড়িং গিলে খায়
সেও যে আমিই।
আমিই সে ব্যাঙ পুকুর জলে খুশিতে যে সাঁতরায়,
আমি সেই সাপ ব্যাঙের মাংস ধীরে ধীরে যে খায় ।
উগান্ডার ওই শিশু আমি অনাহারে অস্থিমজ্জা এক হয়েছে যার,
হাঁটছে শীর্ণ বাঁশের মতো পায়ে,
আমি আবার মুনাফা খোর অস্ত্র বণিক,
মারণাস্ত্র বেঁচে যে রোজ উগান্ডার ওই গাঁয়ে।
ডিঙ্গি নৌকায় শরণার্থী সে মেয়েটি আমি
বয়স মাত্র বারো বছর,
জলদস্যুর হাতে সেদিন ধর্ষিতা হয়ে ঝাঁপ দেয় সে সাগর জলে।
আমি আবার সে দস্যু যার হৃদয় আজও শেখেনি প্রেম
কিম্বা দয়া কারে বলে।
সাংসদ আমি, মন্ত্রী আমি অফুরন্ত ক্ষমতাও যে আমার আছে,
আমি সেই লোক কারখানাতে রক্ত দিয়ে শুধুমাত্র প্রাণটি নিয়েই বাঁচে।
উল্লাস আমার বসন্ত যার উষ্ণ হাওয়ায় পুষ্প ফুটে বিশ্ব ছেয়ে যায়,
অশ্রু ভরা নদীর মতো কষ্ট আমার সুবিশাল চার সাগর ভরে যায়।
দয়া করে আমার সকল সত্য নামেই ডেকো যেন–
আমার যত কান্না হাসি একই সাথে শুনতে আমি পাই।
যেন আমার উল্লাস এবং কষ্ট যে এক বুঝতে আমি পাই।
দয়া করে আমার সকল সত্য নামেই ডেকো–
হৃদয়ের এই দুয়ার আমার খোলা যেন থাকে,
জাগিয়ে দাও অশেষ দয়ায় আমার এই প্রাণটাকে।

প্রবাসে লালিত মাতৃভাষা এবং ডায়াস্পরা সাহিত্য

শেলী জামান খান

মানুষ এবং পরিযায়ী পাখি এই দুইয়ের মধ্যে একটা ক্ষেত্রে যথেষ্ট মিল রয়েছে। মানুষ এবং পাখি এই দুই প্রজাতিই উড়ে উড়ে দূর-দূরান্তে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে ভালোবাসে। বরং সেই ক্ষেত্রে পাখির তুলনায় মানুষের অবস্থান খানিকটা নড়বড়ে। মানুষ নিজে নিজেরই সৃষ্ট নানা নিয়মের বেড়াজালে আটকা পড়ে বেকায়দায় পড়েছে। ভ্রমণবিলাসী মানুষ নিজের চারপাশে গণ্ডি টেনে, সীমানা তুলে নিজের গতিবিধিকেই সীমাবদ্ধ করেছে। কিন্তু পাখিরা আজীবন ভিসামুক্ত, বর্ডার মুক্ত পৃথিবীতে বসবাস করে আসছে। তাই দেশান্তরী হতে মানুষের মতো পাখিদের কোন পাসপোর্ট, ভিসার প্রয়োজন হয় না।

পাখি যেই দেশেই যায়, কণ্ঠে করে বয়ে নিয়ে যায় তার নিজস্ব ভাষা এবং সুর। তাইতো আমেরিকার পাখি এবং বাংলাদেশের পাখি তাদের নিজস্ব 'পাখীয়' সুরেই গান গায়। কিন্তু মানব সমাজে প্রচলিত আছে বহু ধরনের ভাষা। আবার সব দেশের ভাষারই আছে সাহিত্যিকরূপ এবং আঞ্চলিকরূপ। আঞ্চলিক ভাষা সাধারণের কথ্যভাষা হিসেবে বিবেচিত। আমাদের বাংলা ভাষায়ও রয়েছে অনেকগুলো আঞ্চলিক কথ্যরূপ।

নানা সমস্যার সম্ভাবনা জেনেও পাখির মতো মানুষও দেশ থেকে দেশান্তরী হতে পিছু হটে না। দেশান্তরী মানুষ তার কণ্ঠে করে বয়ে নিয়ে যান নিজের মাতৃভাষাকে। মাতৃভাষার মায়া মানুষ কখনো ত্যাগ করতে পারে না। মাতৃভাষাটি সে রক্ষাকবচের মতো সযত্নে কণ্ঠে ধরে রাখে।

আমিও একদিন যাযাবর পাখির মতোই স্বদেশের মায়া ভুলে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলাম। সম্বল ছিল নিজের মাতৃভাষা এবং ইংরেজির আধো আধো বোল। আমার আদি ঠিকানা বা শেকড় পোঁতা রয়েছে বাংলাদেশের বিক্রমপুরে। যত দেশই ঘুরে বেড়াই না কেন, যত ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করি না কেন, কণ্ঠ থেকে সেই বিক্রমপুরী সুরটি কিন্তু আজও একেবারে বিলীন হয়নি। শুদ্ধ বাংলায়, সাহিত্যের ভাষায় কথা বলার যতই

চেষ্টা করি না কেন, কথা বলার টোন শুনে অনেকেই জহুরীর মতো জানতে চান, "আরে তুমি কি বিক্রমপুরের মেয়ে নাকি?" কারণ ওটাই আমার মাতৃভাষা! জন্মের পর থেকে দাদা-দাদি, মা-বাবা'র মুখে বিক্রমপুরী ভাষার ঐ বাঙ্গাল সুরটি শুনেই তো বড় হয়েছি। আমাদের মতো সব অভিবাসীই এভাবে তাদের স্ব স্ব প্রাকৃত ভাষাকে বয়ে নিয়ে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে। অভিবাসী মানুষ প্রবাসে গিয়ে প্রথমেই তাই স্বজনের সন্ধান করে। নিজ অঞ্চলের দু'জন মানুষ একত্রিত হলেই গড়ে তোলে নিজস্ব দেশীয় কমিউনিটি। তাই সুদূর প্রবাসে পাড়ি দেওয়ার পরও আঞ্চলিক ভাষা কখনো বিলুপ্ত হয় না।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য ভাষায়ও রয়েছে ভিন্নতা। প্রাকৃত থেকে আসা ভাষার এই আঞ্চলিকতা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু ইদানীং এই কথ্য ভাষারই একটি নব্যরূপ এবং এর চর্চা প্রকটভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সম্ভবত এর শুরুটা হয়েছিল বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি জনপ্রিয় সিরিজ নাটক থেকে। ইদানীং কতিপয় লেখকের লেখনীর মধ্য দিয়ে এই উপভাষাটি সাহিত্যেও জায়গা করে নিচ্ছে। প্রবাসে জন্ম নেয়া এবং বেড়ে ওঠা প্রজন্মের কথ্য বাংলায় ইংরেজি-বাংলার মিশ্রণে, অভিনব উচ্চারণে বাংলাভাষার আরও একটি উপভাষা সৃষ্টি হয়ে, প্রতিষ্ঠাও পেয়ে যাচ্ছে। এসব মুখের বুলি ধীরে ধীরে লিখিত রূপও পাচ্ছে। হয়তো অচিরেই এই অভিনব উপভাষাগুলো সাহিত্যে পাকাপাকি হবে। বাংলা ভাষাবিদগণ, ভাষা তাত্ত্বিকেরা বাংলা ভাষার উপর এটাকে আগ্রাসন হিসেবে দেখছেন কিনা সেটাই এখন বিচার্য বিষয়।

আমাদের প্রচলিত বাংলাভাষাও একদিনে আজকের পর্যায়ে আসেনি। বাংলাভাষা শত শত বছর আগে ঠিক এমনটি ছিল না। সাধারণ মানুষের মুখের প্রাকৃতভাষা 'মাগধি' রূপান্তরিত হয়ে বাংলাভাষার উদ্ভব হয়েছিল। হাজার বছরের রূপান্তর এবং বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এটি আজকের আধুনিক রূপ পেয়েছে। হয়তো আরও বহুবছর পর ভাষায় আরও পরিবর্তন আসবে। কারন, ভাষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। মানুষের মুখে মুখে এর পরিবর্তন হয়। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এটি সমৃদ্ধ এবং নতুন রূপে বিকশিত হয়।

দুই দশক হলো নিউইয়র্কে বসবাস করছি। আমেরিকা দেশটির 'প্রথম ভাষা' ইংরেজি। তারপর সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নিউইয়র্কের 'দ্বিতীয় ভাষা' স্প্যানিশ। ম্যানডারিন, হিন্দি ও উর্দু ভাষার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 'বাংলা'ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এখানে একটা জায়গা করে নিয়েছে। স্কুলে, হাসপাতালে, বোর্ড অব ইলেকশনের বুথে, ব্যালটে, বাঙালি মালিকানাধীন শপিংমলে বাংলা হরফে লেখাগুলো আমাদের চোখে আরাম এনে দেয়। বাঙালি অভিবাসী হিসেবে বাংলা ভাষার এই অগ্রযাত্রা আমাদের জন্য অত্যন্ত সুখের। অত্যন্ত আনন্দের!

এই বিজাতীয় ভাষার দেশে আমাদেরকে নানা কাজেকর্মে, বাজারে, দপ্তরে, হাসপাতালে, ডাক্তারের কাছে, ট্রেনে, বাসে সর্বত্রই এবং সারাক্ষণই ইংরেজি বুলি আওড়াতে হয়। যদিও নিউইয়র্ক হল ডাইভার্সিটি নগরী। এখানে অনেক ভাষাভাষী মানুষের বাস। কিন্তু এখানে ইংরেজি ভাষাটিই যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারযোগ্য।

সারাক্ষণ বাইরে ইংরেজি বললেও আমরা প্রতিটি সচেতন বাঙালি কিন্তু ঘরে বসে মাতৃভাষাটাই বলার চেষ্টা করি। সন্তানরাও বাবা-মায়ের প্রাকৃত ভাষাটি শেখে। বিদেশি মাটিতে জন্ম নেওয়া, বিজাতীয় ভাষার মাঝে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের সবাই প্রমিত বাংলা না জানলেও কথ্য ভাষাটি তারা নিজের মতো করে রপ্ত করে নেয়।

আমার নিজের লেখালেখির ক্ষেত্র বাংলা ভাষায়। লেখালেখির সঙ্গে জড়িত হওয়ার সুবাদে নিউইয়র্কের অভিবাসী বাঙালি লেখক, কবি এবং সাংবাদিক সবার সঙ্গেই কমবেশি জানাশোনা বা পরিচিতি গড়ে উঠেছে। আমরা যারা প্রবাসে থাকি এবং লেখালেখির ভুবনে বাস করি তারা সবাই দেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ধরে রেখেছি বাংলাচর্চার মধ্য দিয়েই। তাইতো অমর একুশে বইমেলাকে উপলক্ষ্য করে প্রবাসী লেখকদের মাঝেও উত্তেজনার ঢেউ ওঠে। তবে মূল ভূখণ্ডে বসবাসরত কবি, লেখক, সাহিত্যিক গোষ্ঠী কোনো এক বিচিত্র কারণে সাগরপাড়ি দেওয়া প্রবাসী লেখকদের সাহিত্যকর্মকে "ডায়াস্পোরা সাহিত্য" এবং অভাজন লেখকদের "ডায়াস্পোরা লেখক" বলে নামকরণ করে থাকেন। এমনকি বাংলা একাডেমিও পৃথিবীর নানা প্রান্তে বসবাস করা এই প্রবাসী লেখককুলের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করেন বলেই আমার ধারণা! সমস্ত গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রবাসী লেখক আজও বাংলা একাডেমি পুরস্কার না পাওয়ায় প্রবাসী লেখক মহলে অভিযোগটি পুঞ্জীভূত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে নানা কারণে বিদেশে জীবনযাপন করে আসছি, আমাদের কাছে প্রবাসের এই জীবন যতখানি বাস্তব এবং প্রিয় ততখানিই প্রিয় পেছনে ফেলে আসা স্বদেশ বা মূল

ভূখণ্ডটি। তাই প্রবাসী মানুষ মাত্রই স্বপ্নচারী, ভাবাবেগ তাড়িত এবং নস্টালজিক। এঁদের লেখনীতে যে স্বদেশ প্রেম, স্মৃতিকাতরতা, আহাজারি মূর্ত হয়, তা দেশীয় লেখকদের তুলনায় ভিন্নমাত্রা পায় বলেই আমার বিশ্বাস। দেশের বাইরে থেকে দেশকে অবলোকন করার যে সুযোগ আমরা পাই, তার যথার্থতা ফুটে ওঠে আমাদের লেখনীতেও। সুতরাং দেশের বাইরেও যে বৃহৎ একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠছে, যারা নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও কেবল বাংলাভাষাকে ভালোবেসেই বাংলাসাহিত্যে বুঁদ হয়ে আছে, তাদের এই অবদানকে বাংলা একাডেমি মূল্যায়ন করবে-এটাই কাঙ্ক্ষিত।

সদ্য দেশ ছেড়ে আসা শঙ্কিত একজন মানুষ বিদেশের মাটিতে পা ফেলে প্রথমেই শুরু করে টিকে থাকার লড়াই। পায়ের নিচে একটু মাটি, মাথার ওপর একটু আচ্ছাদন, দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগাড় করার জন্য শুরু হয় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবন। প্রবাসী লেখকই বলি বা ডায়াস্পোরা লেখকই বলি, এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের গল্প, নতুন একটি আগামী গড়ার স্বপ্নের কথা তারা ছাড়া আর কে লিখবে এমন করে? সেদিক থেকে এই ডায়াস্পোরা সাহিত্যই বাংলা ভাষার এক অনন্য সম্পদ বলে গণ্য হওয়া উচিত বলে মনে করি।

বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে "বারো মাসে তের পার্বণ" নামে একটি প্রচলিত মিথ আছে। যে গল্প আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলি। অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা। শহীদ মিনারের কথা। একাত্তরের ভয়াবহ মুক্তিযুদ্ধের কথা, উদ্বাস্তু দিনগুলোর কথা, শহিদ এবং বেঁচে যাওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। আমাদের সন্তানরাও তাদের পিতা এবং পিতামহদের, মাতা এবং মাতামহীদের ভাষাপ্রেম, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগের গল্প শুনে শুনে বড় হয়। তারাও তাদের পূর্বসূরিদের নস্টালজিয়াকে অনুভব করে, মূল্যায়ন করে, শ্রদ্ধা করে। নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে এটাই আমাদের প্রবাসি মা-বাবাদের অনেক বড় পাওয়া। আমাদের নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকার বাঙালি কমিউনিটির দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই? দেশের ষোলো আনা না হোক চৌদ্দ আনাই আমরা বাস্তবায়ন করেছি এই ভিনদেশি মাটিতে। প্রবল বরফঝরা দিনগুলো বাদ দিলে বারো মাসই আমরা ব্যস্ত থাকি দেশীয় কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি উদযাপনে। পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, বিজয় দিবস, বাংলা বইমেলা, ঈদ, পূজা-পার্বণসহ নানা অনুষ্ঠানে সবার সঙ্গে সবার দেখা হয়। ঘরোয়া আড্ডা হয়। সাহিত্য আড্ডা, গান, কবিতা পাঠের আসর বসে। সবচেয়ে আনন্দের কথা এর সবকিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে আমাদের উত্তরসূরিরা। যারা দেশের মাটিতে পা রাখেনি, দেশের জল-হাওয়া যাদের গায়ে লাগেনি সেই কচিকচি কণ্ঠেও ধ্বনিত হন নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত। এরাই আমাদের গর্ব। তাদের হাতেই আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে অর্জিত লাল-সবুজ পতাকা রেখে যাব।

দেশপ্রেমে, দেশের ভালো-মন্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, জড়িয়ে আছে এই নস্টালজিয়াগ্রস্ত প্রবাসী বাঙালিরা। উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বড় এবং জমজমাট বইমেলা বসে সারা পৃথিবীর রাজধানী নামে খ্যাত এই নিউইয়র্ক নগরীতে। সারা পৃথিবী থেকে বইপ্রেমী, সাহিত্যপ্রেমী লেখক এবং পাঠকের সমাবেশ ঘটে নিউইয়র্ক নগরীর 'বাঙালি পাড়া' বলে খ্যাত কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসে।

প্রবাসে বাংলা ভাষার চর্চা, বাংলা ভাষাকে লালন এবং ধারণ করে আছে এই তথাকথিত ডায়াস্পোরা মানুষগুলোই।

বর্ণমালার সুখ দুঃখ

নাসিমা আক্তার

"ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।" ওরা নিতে পারেনি আমাদের মাতৃভাষাকে কেড়ে।

পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্র বা দেশ ভাষার জন্য রক্ত দেয়নি। একমাত্র বাঙালি জাতি ভাষার জন্যপ্রাণ দিয়েছে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের এবং তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়। আমি যখন আমেরিকা প্রবেশ করলাম সবচেয়ে বেশি চমৎকৃত হয়েছিলাম প্রবাসে বাংলা ভাষাভাষি মানুষদের একটি আড্ডা বা আসর জমানোর জন্য একটি লোকালয় রয়েছে। যার নাম জ্যাকসন হাইটস। তার আগে পর্যন্ত মনটা অতটা সায় দিত না আমেরিকা থাকার জন্য। এরপর একে একে নতুন নতুন বন্ধু পরিজনদের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভালো লাগতে শুরু করল সব কিছু। এ প্রবাসে সবার আন্তরিকতায় ক্রমশ মুগ্ধ হতে থাকলাম।

জড়িয়ে পড়লাম নানান বংলা ভাষাভাষি সংস্কৃতিক অনুষঙ্গের সঙ্গে। বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছিলাম সবাই এত উচ্ছ্বাস আর উৎসাহ নিয়ে এই প্রবাসে নিজের দেশের প্রতি, নিজের ভাষার প্রতি মমতা বিলিয়ে দিচ্ছেন। এখানে যেমন রয়েছে ছোটদের বাংলা শেখানোর নানান প্রতিষ্ঠান তেমনি বাংলা সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ গড়ে তোলার জন্য রয়েছে প্রবাসে জন্ম নেওয়া বা বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মদের নিয়ে নানান সাংস্কৃতিক সংগঠন বিপা, বাফা, শিল্পকলা একাডেমি, আনন্দধ্বনি, এ ছাড়া সকল নির্বিশেষে এবং সবার জন্য উন্মুক্ত যে সাহিত্য পরিমণ্ডলটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে সেটি হলো "সাহিত্য একাডেমি" যেখানে নিয়মিত প্রতি মাসের শেষ শুক্রবার বসে সাহিত্য আসর যা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। যেখানে রয়েছে নিজেকে বাংলা ভাষার পথিকৃৎ করে গড়ে তোলার অনন্য সুযোগ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই করোনাকালীন দুঃসময় আমাদেরকে পরস্পর থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে কিন্তু তাতেও থেমে থাকেনি বাংলা ভাষাভাষি মানুষদের বাংলাচর্চা। শুরু হলো অনলাইনভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা। নিজেদের সব দূরত্বকে ঘুচিয়ে দিয়ে নতুন এক মাত্রা যোগ হলো। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এতটা সক্রিয় করে তোলার জন্য যারা সব সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখছেন তারা যে কেবল বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করছেন তা নয়, সমৃদ্ধ করেছেন নিজ দেশকে।

এখন আমেরিকার বিশেষত নিউইয়র্কের ট্রেনে, সাবওয়েতে, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যখন বাংলায় অনেক ধরনের টাইটেল লিখা দেখতে পাই, তখন মনের মধ্যে এক অনন্য অনুভূতি জেগে ওঠে, ভীষণ আনন্দ পাই। প্রবাসে জন্ম নেওয়া শিশুগুলো যখন বাংলায় গান করে অথবা কবিতা পড়ে কিংবা বাংলায় কথা বলে সেটি খুব অকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এরা যেমন পুরো বিষয়টিকে উপভোগ করে তেমনি বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের ব্যস্ত রাখতে পারছে। তেমনি নানান অসংগতিমূলক পরিবেশ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারছে। যার ফলে আমরা নিজেরাও একটি সুস্থ সুন্দর এবং সফল সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখে সুখ ভোগ করতে পারছি।

তাই প্রবাসে বাংলাচর্চার পাশাপাশি আমাদের বাংলা ভাষার রক্তক্ষয়ী ইতিহাসও প্রবাসে জন্ম নেওয়া বা বেড়ে ওঠা সন্তানদের কাছে তুলে ধরতে হবে তাহলেই তারা এ ভাষার তথা বাংলা ভাষার প্রতি সঠিক সম্মান প্রদর্শন করে এর যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে এবং বাংলা ভাষার প্রতি মমতা বা ভালোবাসার স্থানটি তৈরি করতে পারবে। তারা পুনরায় তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা তুলে ধরবে। নয়ত বিষয়টি কেবল কবিতা পড়া, গান বা নৃত্যে অংশগ্রহণ করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই আসুন আমরা ঘরে ঘরেই রফিক, সালাম, বরকতের মতো হাজার প্রাণের রক্তাক্ত ইতিহাসে গড়াবাংলা বর্ণমালার করুণ কাহিনীগুলো প্রবাসে জন্ম নেওয়া বা বেড়ে ওঠা সন্তানদের কাছে বর্ণনা করি। আমি মনে করি এটি একজন সচেতন বাঙালি হিসেবে আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। তা না হলে রক্তের দামে কেনা বর্ণমালা নীরবে নিঃশব্দে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে।

প্রবাসে বাংলাচর্চার প্রতিবন্ধকতা

হাসান আমজাদ খান

বাংলাভাষী মানুষ যে যেভাবেই প্রবাসে এসে নোঙর করুন না কেন, যে দেশে বা যে কেন্দ্রে এসে তিনি উপনীত হন সেই দেশের, সেই সমাজের ভাষা তাকে প্রভাবিত করবেই। এই প্রভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক। ইতিবাচক প্রভাবের মধ্যে দেখা যায় তাদের মধ্যে যারা ভাষাকে বুকে প্রতিপালন করেন, সৃষ্টিশীল কাজে নিজেকে জড়িত করতে পারেন। তার সংখ্যা নিতান্তই কম। নিচের বিষয়গুলো সাধারণত বিদেশে ভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে:

১। অভিবাসীদের ভাষা: এখন বেশিরভাগ প্রবাসীকেই ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা প্রমাণ করে এসব দেশে আসতে হয়। সুতরাং জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় তাদের বিশেষ পারদর্শী হতে হয়। যদিও বাংলা পুরোটা তারা ভুলে যান না, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রকৃত রসাস্বাদনের জন্য যে তাগিদ থাকা দরকার তা আর অবশিষ্ট থাকে না। ফলে বাংলা ভাষা শুধু ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

২। শিশুদের বাংলা ভাষা: বাঙালি শিশু যারা অল্প বয়সে এসব দেশে আসে বা যারা এসব দেশে জন্ম নিচ্ছে তাদের অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। তারা না পারে তারা কি চায় সেটা বলতে, না পারে মা বাবা কি চাইছে সেটা বুঝতে। তাদের মা বাবাও বুঝতে পারেন না কিভাবে শিশুদের বাংলা ভাষায় কথা বলা, লেখা বা পড়ার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা যাবে। ফলত বাসায় মা বাবার বাংলায় কথা এবং স্কুলে ইংরেজিতে লেখাপড়া করার ব্যস্ততা তাদের ক্রমাগত একটা মানসিক চাপের মধ্যে ফেলে দেয়। এটা সারাজীবন চলে এবং শেষ হয় আধো আধো বাংলা কথা বলতে পারার মধ্যে দিয়ে।

৩। অন্যান্য ভাষার প্রভাব: বিদেশে তো বাংলা একটি সংখ্যালঘু ভাষা। মানে এখানে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই অন্য কোনো ভাষা শুনতে হয়। এবং শুনে নিজের ক্ষমতায় সেটা আমাদের ভাষায় অনুবাদ করে বুঝতে হয় এবং বলতে হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষে দক্ষতার পার্থক্য রয়েছে। তাহলে নিজের ভাষা যতটুকু আমরা শিখে বিদেশে এসেছি তার থেকে বেশি আর শেখা সম্ভব নয়, বরং অন্য ভাষা বিশেষত ইংরেজি ভাষা শিখতে শিখতেই সময় চলে যায়। এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তিবিশেষে ভিন্নতা রয়েছে।

৪। উন্নাসিক বাঙালির ভাষা ত্যাগ: গত পনেরো বছরের প্রতি বছর অন্তত একজন এরকম প্রাণীর সঙ্গে আমার দেখা এবং কথা বলার দুর্ভাগ্য হয়েছে যে, সে প্রাণী তার ঔরসজাত সন্তানকে বাংলা শেখানো দরকার- এরকম কোনো প্রয়োজন ও দায়িত্ব বোধ করে না। অধিকন্তু ঐসব সন্তান বয়স ষোলো উত্তীর্ণ হলে এদেশের বার বা পাবে গিয়ে বয়স কম দেখিয়ে মদ বা বিয়ার

পান করবে- এমত তিনি বিশ্বাস করেন। আমি নিশ্চিত এই প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা প্রবাসীদের মধ্যে নেহাৎ কম নয়।

৫। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলা শিক্ষা: অন্যান্য দেশের কথা জানি না, তবে আমেরিকা, কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বিদেশি ভাষা শিক্ষার ক্যাটাগরিতে বাংলা শেখার সুযোগ আছে। কিন্তু এখনো এমন কোনো বাংলাদেশি স্টুডেন্ট দেখিনি যে ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ বা জার্মান ভাষা বাদ দিয়ে বাংলা নিয়ে পড়ালেখা করছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং বই-পুস্তকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

৬। বাংলা কমিউনিটির উদ্যোগ: বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য শুধুমাত্র ভাষা শিক্ষার জন্য পেশাদার এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বাংলা কমিউনিটি গ্রহণ করতে পারেনি। ঢাকায় যেমন গ্যেটে ইনস্টিটিউট আছে, ঐরকম কোনো প্রতিষ্ঠান যেমন নজরুল ইনস্টিটিউট বা শহীদুল্লাহ্ ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠেনি। কেউ কেউ অসংঘবদ্ধভাবে কিছু কিছু অপেশাদার সাংস্কৃতিক সংগঠন করেছেন সেখানে ভাষা বা সাংস্কৃতিক কাজের চেয়ে দলাদলি, গালাগালিই হয়ে থাকে বলে প্রত্যক্ষ করি।

কী করণীয়

দেশে থাকলে একটা সুবিধা আছে, যা-ই হোক না কেন সবকিছুর জন্য সরকারকে দোষ দেওয়া যায়। কিন্তু বিদেশে আর সেটা করা যাচ্ছে না। ফলে এসব দেশ আইনগত বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে যেটুকু সুযোগ সুবিধা রেখেছে তার ওপর ভরসা করতে হয়। সুতরাং আমাদের আরও দায়িত্বশীল হয়ে কাজ করতে হবে যেন আমরা-

১. ঘরে ঘরে বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করি। সেটা সম্ভব। একটা উদাহরণ দেই- কলকাতার ছেলেমেয়েরা কেন ক্লাসিক্যাল বাংলা গান ভালো গায়। তার কারণ তাদের প্রতিটি বাড়িতে গান শেখানোর পরিবেশ আছে। আমরা যদি ঘরে বাংলা বলি, সপ্তাহে অন্তত একদিন সবাই একসঙ্গে বসে বাংলা সিনেমা নাটক দেখি, তাহলে সেটা সহজে বাংলার প্রতি আগ্রহ বাড়াবে।

২. দলাদলি গালাগালি না করে নতুন প্রজন্মের জন্য পেশাদার ভাষা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

৩. এদেশের স্কুল-কলেজে ভাষা শিক্ষার জন্য শিক্ষক এবং যথেষ্ট বই পুস্তকের জন্য এদেশের স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

৪. কাকের লেজ কেটে ময়ূরের পেখম জুড়ে দিলে যেমন ময়ূর হওয়া যায় না তেমনি নিজের ছেলেমেয়েদের বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি যত্নশীল না হয়ে প্রকৃত পশ্চিমাও হওয়া যাবে না। তাই উন্নাসিকতা বাদ দিয়ে নিজের মায়ের ভাষায় পরিবারের সবাই কথা বলার চেষ্টা করতে হবে।

লার্নিং ফ্রম বার্নিংঘাট

রওশন হক

ইতিহাস বলে বাঙালি বাংলা ভাষা লিখে আসছে প্রায় হাজারখানেক বছর ধরে। সংস্কৃত ব্যাকরণ রীতি পাঠ করেই বাংলা লিখিত ভাষার চর্চা শুরু হয়েছিল। উইলিয়াম কেরি বাংলা ভাষার যে সর্বসম্মত ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তা মূলত সাধু ভাষার ব্যাকরণ। কিন্তু কথ্য বাংলা ভাষার কোনো নির্দিষ্ট একটি চেহারা নেই। হতেও পারে না।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার কথার ধরন বৈচিত্র্যময়। তেমনি তার বিবিধ উচ্চারণ রীতি। বাক্য গঠনের বিভিন্নতা ও শব্দে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের খুব বেশি প্রভাব দেখা যায়। এটা নতুন নয়, বেশ পুরনো। ধর্ম-জাতি-জীবনাচারের সূক্ষ্ম প্রভাব নিয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলা ভাষার শরীর গঠন হয়েছে। ভাষা এমনই এক জিনিস যা রাজনৈতিক মানচিত্রের সীমারেখা মেনে চলে না। ভাষা আঞ্চলিক কথন-কাঠামোয় গড়ে উঠার প্রভাব প্রবহমান ধারায় বয়ে যাওয়া একটি আদি ঐতিহ্য। তাই আদিকাল থেকেই বাংলাদেশের সব অঞ্চলের ভাষার বিচিত্র তারতম্য মিলেমিশে তৈরি করেছে বাংলা ভাষার অবয়ব। এ ভাবেই বাংলা ভাষার বহমানতা, সমৃদ্ধি, ব্যাপ্তি ও বিকাশ।

মাতৃভাষা হিসেবে বিশ্ব-ভাষা তালিকায় বাংলার অবস্থান পঞ্চম এবং বহুল ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে এর অবস্থান সপ্তম। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বাংলায় কথা বলেন ৩০ কোটির বেশি মানুষ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির এমনই এক দিনে কি হয়েছিল সেই ইতিহাস সকলেরই জানা। বিদেশি বন্ধুরা বলে "তোমাদের ভাষাটা রসগোল্লার মতন মিষ্টি" কেউ কেউ বলেন অনেকটা ফ্রেঞ্চ ভাষার মতন। বাংলা ভাষার এত সম্ভার থাকা সত্ত্বেও, কেন বিশ্বমানের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত? প্রায়ই শুনি ইংরেজি সাহিত্য নাকি বাংলা ভাষাকে গ্রাস করছে। শুধু কি তাই? আমি তো বলব ডিজিটাল হিন্দি ভাষা আমাদের শখেই বসার ঘর থেকে শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছে। ইদানীং ছোট বাচ্চাদের প্রায়ই হিন্দি সিরিয়ালের ভাষা বলতে শুনি। ইংরেজি

তো সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই বলছি। এখন তারা শিখে গেছে না কে no থেকে কীভাবে নেহি বলতে হয়। আমারাও শিখে গেছি আরে দোস্ত না বলে, আরে ইয়ার বলে নিজের স্ট্যাটাস জানান দিতে প্রায়শই শোনা যায়।

সভা সেমিনারে বলতে শোনা যায় বাংলা ভাষা নাকি বিদেশি ভাষার আগ্রাসনে হুমকির মুখে পড়েছে। কেনইবা কেউ তাকে আগ্রাসন করতে যাবে, ঠিক বুঝতে পারি না। কার দায় পরেছে বাংলা ভাষাকে এমন রসাতলে ঠেলারছেড়েনা কি গ্লোবালাইজেশান পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন হয়ে প । আমিও এখানে বিশ্বায়ন না লিখে গ্লোবালাইজেশন ব্যবহার করেছি অনেকটা বুঝতে সহজ হবার জন্যে। এতে কি বাংলা ভাষার অবমাননা হবে? ভাষার মাতৃত্ব কি ঔরসেই সীমাবদ্ধ? না বিকাশের মহিমায় উদ্ভাসিত হবে? এসব ভাববার সময় এসেছে । আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে ভাষায় কথা বলে, সেটা কি বিশুদ্ধ বাংলা? শুধু তারা নয় আমি নিজেও এদের দলেই আছি। যদি সেই ভাষাই বর্তমানের প্রয়োজনে সাহিত্যে ব্যবহার করা হয়, তাহলে কী ভাষার মান সন্মান একেবারেই থাকবে না। গ্লোবালাইজেশনের পথে হেঁটে ভাষাটাকে বিশ্বের দরবারে স্থায়ী করে পৌঁছে দিতে কী কী করা যেতে পারে আমরা কি সেসব নিয়ে গবেষণা করব? না কি গেল গেল সব রসাতলে গেল বলে আরেকটা আন্দোলনের ডাক দিব?

ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করা কিছু অর্ধশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ছিলেন যারা 'বাবু ইংলিশ' ভাষার জন্ম দিয়েছিলেন। কিছু ইংরেজ কর্মকর্তাও নিজেদের বাংলা-বিদ্বান জাহির করতে গিয়ে হাস্যকর উচ্চারণে 'সাহেবী বাংলা' ভাষা তৈরি করেছিলেন । সে সব নিয়ে লর্ড কার্জনের মতো প্রতাপশালী শাসকও তার 'অ্যা ভাইসরয়'স ডায়েরী' তে, পরে যা বই হিসেবে বের হয় "অ্যা ভাইসরয়'স ইন্ডিয়া: লিভস ফ্রম লর্ড কার্জন'স নোটবুক", মজার মজার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তার অফিসে যে সকল 'বাবু ইংলিশে' লেখা চিঠিপত্র, দরখাস্ত জমা পরতো সেখান থেকে তিনি রীতিমতো বাছাই করে 'বাবু ইংলিশ' সংকলন তৈরি করেছিলেন । আমি পাঠকদের জন্য তার থেকে কিছু অংশ এখানে হবহু তুলে দিলাম।

এ সময়ের মতো সে আমলেও চাকরি পাওয়া নিয়ে খুব কাড়াকাড়ি হতো। আগে ভালো দরখাস্ত পাঠাতে পারলে কিছুটা সুবিধার সম্ভাবনা থাকে। তাই অনেক চাকরি প্রার্থী অগ্রিম খবরের সন্ধানে শ্মশানঘাটে গিয়ে মৃত ব্যক্তির অফিসে পদ পদবীর ঘর বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করে দরখাস্ত পাঠাত মৃতের চাকরিস্থলে। ইংরেজি ভাষায় লেখা সেই দরখাস্তের শুরুটি ছিল এ রকম- "লার্নিং ফ্রম বার্নিংঘাট(শ্মশানঘাট)দ্যাট এ পোস্ট হ্যাজ ফলেন ভ্যাকেন্ট, আই বেগ টু অ্যাপ্লাই ফর দি সেইম।"
আরেকবার এক ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির শরীরে একটা 'ফোঁড়া' হলো, ফোঁড়ার ব্যথায় কাতর বেচারার অফিস থেকে ছুটি দরকার। তখন তিনি বাধ্য হয়ে একটা ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন । দরখাস্তটি ছিল এমন- 'সিন্স লাস্ট টু ডেজ আর মোর আই এ্যম মাচ ট্রাবল উইথ দি লারজেস্টসাইজ বয়েল, অ্যাজ পার মার্জিন'-সেখানে মার্জিনে একটা ফোঁড়ার ছবি আঁকা ছিল। এদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাৎক্ষণিক বুদ্ধিতে নাপিত ও ফিরিঙ্গির চুল কাটার গল্পের সমাধান সবার জানা। ব্রিটিশ বাবু নাপিতকে ড্যাম বলায় সেখানে ঝগড়ার তৈরি হলে বিদ্যাসাগর বুঝিয়েছিলেন ড্যাম মানে হলো ভালো। যেখানে

ঝগড়ার শেষে নাপিত বলেছিলেন দেখুন বাবু, ড্যাম মানে যদি ভালো হয়, তাহলে আমি ড্যাম, আমার বাবা ড্যাম, আমার চৌদ্দ গুষ্টি ড্যাম। আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়, তবে ও ড্যাম, ওর বাপ ড্যাম, ব্রিটিশের গুষ্টিসুদ্ধ ড্যাম। শুধু ড্যাম না ড্যামড্যামাড্যামড্যাম।

ইতিহাস বলে বাঙালি বাংলা ভাষা লিখে আসছে প্রায় হাজার বছরের বেশি সময় ধরে। সংস্কৃত ব্যাকরণ রীতি পাঠ করেই বাংলা লিখিত ভাষার চর্চা শুরু হয়েছিল। ভাষাকে যদি নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। তাহলে মূল নদীটিকে বাদ দিয়ে তার জলরাশি তার শাখা-প্রশাখা নানা নদীর সঙ্গে মিলে মিশে বইতে থাকে। বাংলা ভাষার এই গতিশীলতাকে মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে উঠতে দেখেই সমাজে আশঙ্কার মেঘ জমে ওঠে। এ কথা তো সত্য যে প্রচলিত মূল ধারার বাংলা ভাষায় ইংরেজি ছাঁচ অনেক

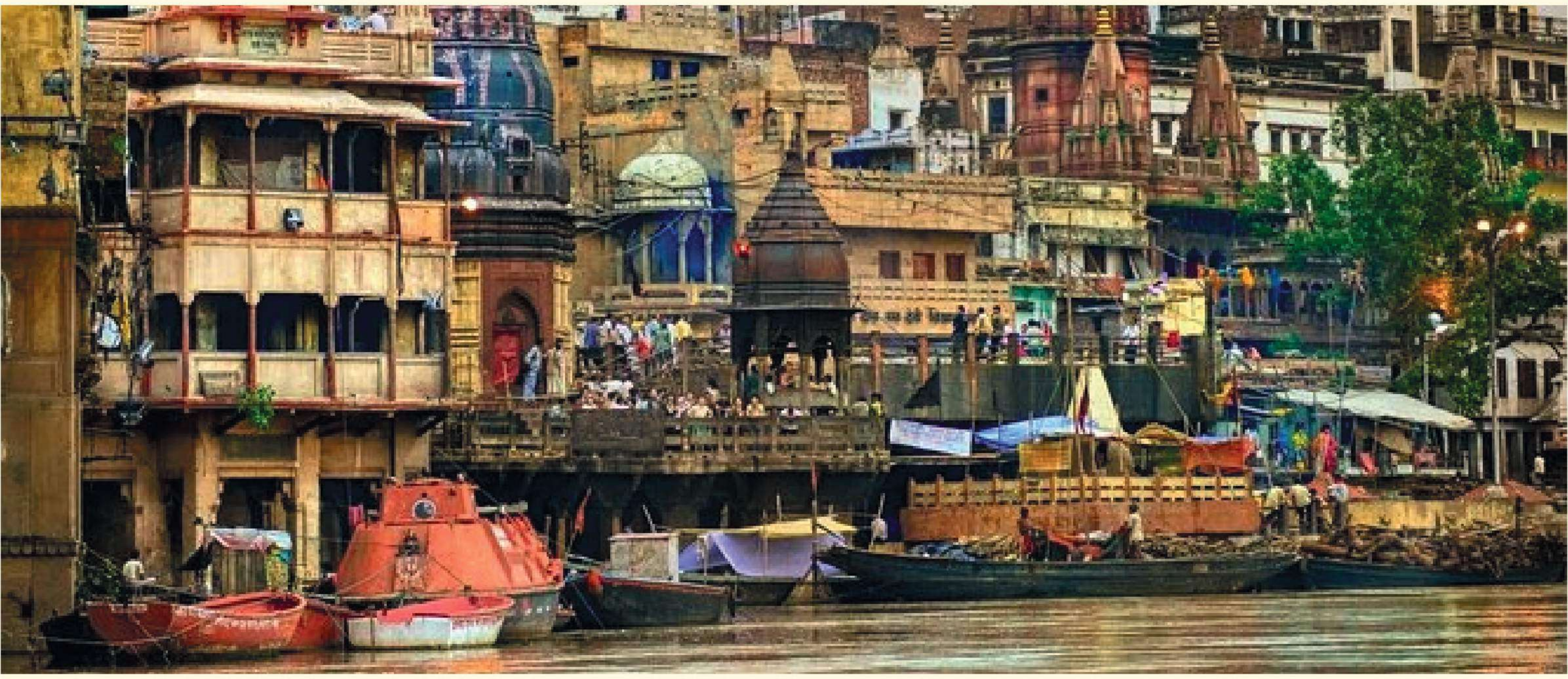

দিনের আমদানি। সেই সঙ্গে ভাষার অস্তিত্ব সংকটের প্রসঙ্গটিও উঠে আসে। এ নিয়ে গেল গেল রব উঠেছে। তার কিছু নমুনা এখানে দিতে চাই।

সে তো গেল। আসুন বর্তমানে ফিরে আসি। এই তো সেদিন ফোন দিয়েছি বন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাব বলে। অল্প সময়ের কথা বলা। ভালো করে খেয়াল করলাম দু মিনিটে সে দুবার বলল, 'আরে ইয়ার কল দিবার আর টাইম পাও না?' কথা শেষে বলল টীগ হ্যয় থ্যাংকস বাই। আমেরিকায় জন্ম নেওয়া বা বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের বাংলা শুনলে মনে হবে কোথাও বোমা ফাটছে। যেমন অফিস থেকে ফিরে বাথরুম বন্ধ দেখে মেয়ের কাছে জানতে চাইলাম,

-তুমি কি গোসল করেছ?

সে জবাবে বলে বসে,

-আমি গোসলড ইয়েসটারডে। তার বাংলিশ শুনে রাগে দুঃখে কষ্ট পাবেন ভাবছেন? না এখনো বাকি আছে, এবার জানতে চাই,

-তুমি কি স্কুলের হোমওয়ার্ক শেষ করেছে?

-আমি করিইং তো।

-কী বললে? করিং? মানে কী?

-আমি ফিনিশ করছি না মা। এবার মেয়ের মুখে একেবারে আঞ্চলিক সিলেটী টোনের কথা শুনে আপনি আঁতকে উঠলেও তার কথার মাহাত্ম্য কিছুটা বোঝা গেল বলে তাকে তাড়া দিয়ে বলেন,

-খাওয়া শেষে তাড়াতাড়ি হোমওয়ার্ক শেষ করো।

সেও ঝটপট উত্তর দিয়ে দেয়,

-মম আই উইল ফিনিশ ইট আজকু রাইতে।

হাসবেন না কাঁদবেন? আপনি শুদ্ধ বাংলা শেখানোর চেষ্টা করলেও সন্তান যেহেতু ইংরেজি বলার দেশে বড় হচ্ছে তাই সে ইংরেজি শিখেই বড় হবে। তবে শুদ্ধ ভাষা শিখবে সেটার গ্যারান্টি নেই। তারা তাই শিখবে যাদের সঙ্গে তার উঠাবসা। তবুও খুশি হতে হয় তারা আঞ্চলিক ভাষা শিখছে। আমার বন্ধুর ছেলে মসজিদে ইফতার করাকে বলে, বাবা লেটস গো আল্লাহ পার্টি? এই শহরের বাচ্চাদের আড্ডায় কান পাতলে শুনবেন তারা সহজেই বলছে, আমি যাইছি না বা করছি না।

এসব তো গেল বাংলিশে কথোপকথন। নিউইয়র্কে এই প্রজন্মকে বাংলা লেখা শেখানোর জন্য কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলা স্কুল চালু হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে এই শহরে মানুষের বসবাস। বলা যায় দেশের যে যেই এলাকা থেকে এসেছেন তাদের ছেলেমেয়েরা ইংরেজির পাশাপাশি সেই ভাষায় কথা বলতে শেখে।

এ ছাড়াও সাম্প্রতিক কালের কিছু নিত্য ব্যবহার্য বাংলা ভাষা এখন সবার মুখে মুখে যেমন স্ট্যাটাস, ট্যাগানো, আপলোড, ছবি পোস্ট করা, ডিলিট, রিমুভ, কল মি, স্যরি, লাভ ইউ, হেপি বার্থডে, হেপি এনিভারসিরি, শিট হোলি শিট, ইয়ার(বন্ধু), টিগ হ্যয়, মাস্তি, দোস্ত জিনিসটা সেরাম জোস, চুপ যা না ইয়ার, এ রকমই অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়, যা কিনা হিন্দি ইংরেজি

বাংলিশ হয়ে আমাদের ভাষায় মিশে গেছে। এসব টেবিল-চেয়ারের মতোই হিন্দি সিরিয়াল দেখে তাদের ভাষা অনায়াসে এখন বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে ঢুকে পড়েছে। বাংলাদেশে টিভি সিরিয়ালে আঞ্চলিক ভাষার নামে সম্পূর্ণ মনগড়া বিকৃত বাংলার ব্যবহার বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক চলনের যে ইঙ্গিত দেয়, তাতে সেদিন খুব দুরে নয় যেদিন আসল বাংলা ভাষা হারিয়ে যাবে। গত দু'দশকে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে নতুন প্রজন্মের বড় অংশের কথ্য বাংলায়, যে জগাখিচুড়ি ভাষা শুনলে বুঝে ওঠা যায় না, আসলে কোনো ভাষায় কথোপকথন চলছে।

ভাষা গেল গেল রব আছে ঠিকই কিন্তু তার জন্য যথেষ্ট দরদ আছে এমন কোন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। যুগে যুগে সমাজ পরিবর্তনের ছাপ ভাষা ধারণ করবে সেটিই স্বাভাবিক। তাই কবির ভাষায় বলতেই "তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি"।

বাংলা ভাষা নিয়ে দেশে এখন আরেকটি সমস্যা হচ্ছে। বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে এক অদ্ভুত ভাষা তৈরি হচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনে এখন সম্বোধন হিসাবে 'ব্রো'(ভাই), 'সিস'(বোন), 'মেট'(বন্ধু) ইত্যাদি শব্দ বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো ভাষাদূষণ। শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লিখেছিলেন-'ভাষাদূষণ নদীদূষণের মতোই বিধ্বংসী'। তার মতে, বাংলাদেশে নদীদূষণ ও ভাষাদূষণ দুটোই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে এবং ক্রমাগত বাড়ছে। যে ভাষার জন্য আমাদের রক্ত দিতে হয়েছে, আমরা কি সেই বাংলা ভাষার চর্চা সঠিকভাবে করতে পেরেছি?

বাংলা বানান রীতির পরিবর্তনের কারণে যে অনেক শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তা সবাইকে বুঝতে হবে। অন্যদিকে, বাংলার সঠিক উচ্চারণেও রয়েছে অনেক সমস্যা। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক ও লজ্জাজনক। শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, ভাষাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। জ্ঞান অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজিকে রপ্ত করতে হলেও আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে ভুলে গেলে চলবে না। এর সঠিক প্রয়োগ বা ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি, কিন্তু আমাদের মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম অবশ্যই বাংলা।

বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার জন্য এর সঠিক ব্যবহার ও প্রচলন দরকার। গোটা জাতি যেন রক্তের বিনিময়ে আনা বাংলা ভাষাকে অন্তর থেকে সঠিকভাবে ব্যবহার ও রক্ষা করতে পারে, সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তবে সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের মানসিকতায়। বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য আমাদের ইচ্ছাটাই প্রধান। আমাদের আইন আছে, সুযোগ আছে। তারপরও আমরা বাংলাকে অবহেলা করি।

ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের ভাষার মাস, আবেগের মাস। বলতে বাধ্য হচ্ছি এবং আমার সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন যে, শুধু এ মাসটি এলেই আমরা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করার অঙ্গীকার করি এবং ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এরপর আবার যেমন চলছিল, তেমনি চলতে থাকে। প্রশ্ন হলো, বাংলা ভাষাকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করা, বাংলাকে অবহেলা করা কিংবা অন্য ভাষার প্রতি ব্যাপক আগ্রহ আমাদের কি আদৌ সঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছে? নাকি এখনো বাংলা নিয়ে লার্নিং ফ্রম বার্নিংঘাটেই আটকে আছি?

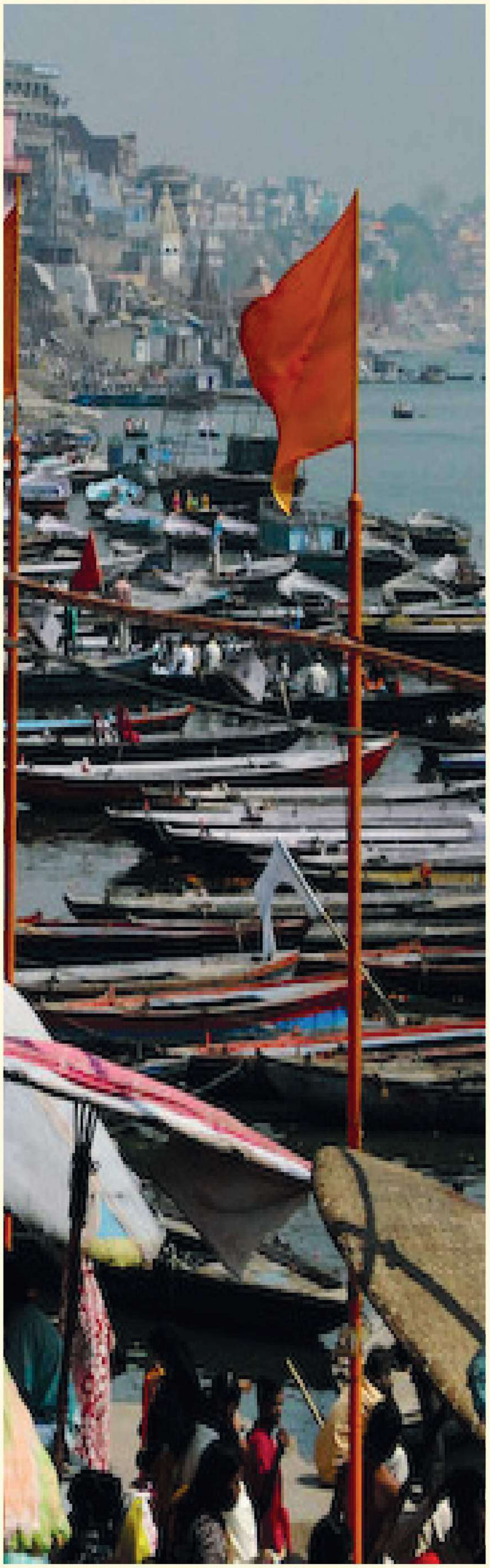

প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চা

এন্থনি পিউস গোমেজ

দেশের সঙ্গে প্রবাসের রয়েছে ভৌগোলিক দূরত্ব, কিন্তু তার চেয়ে নিবিড় হলো হৃদয়ের নৈকট্য! আমরা যারা দেশ ছেড়ে প্রবাসে এসেছি, তারা প্রবাসী, অনাবাসী, অভিবাসী, এনআরবি হিসেবে পরিচিত। দেশ থেকে প্রবাসে আমরা সবাই অভিবাসন প্রক্রিয়ায়সহ নানা প্রক্রিয়ায় পাড়ি জমিয়েছি। সেটা শুধু নিজের উন্নত জীবনযাপনের অভিলাষ নয়, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যের স্বপ্ন! স্বদেশের মাটি ছেড়ে যখন আমরা প্রবাসের মাটিতে পরিবার নিয়ে একটি নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করি, তখন অনেক কিছুই আমরা বিসর্জন দিয়ে থাকি নতুন কিছু অর্জনের আশায়। উন্নত জীবনের অলীক স্বপ্নে বিভোর আমরা প্রবাস জীবনের সমস্ত চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে ছুটে যাই সামনের দিকে ধোঁয়াশা পথ ধরে ভবিষ্যের বলয়ে।

প্রবাসের যেখানেই বাঙালিরা ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানেই গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে এক খণ্ড বাংলাদেশ। প্রবাস জীবনে আমরা ধীরে ধীরে স্বদেশের ছোঁয়া থেকে, স্বদেশের প্রাত্যহিক প্রেক্ষাপট থেকে বাহ্যিকভাবে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, কিন্তু সে শুধুমাত্রই জীবনসংগ্রামের তাগিদে, অন্তরের গভীরে নাড়ির টান কখনো হালকা হয়ে যায় না, ম্রিয়মান হয় না, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মা-মাটি-মানুষের ছোঁয়া পাবার জন্য মনটা উতলা হয়ে উঠে, স্মৃতিকাতরতায় নস্টালজিক হয়ে উঠি আমরা, স্বদেশকে যেন আমরা আরও গভীরভাবে ভালবাসতে শিখি। ভালবাসার টানেই প্রবাসের মাটিতে অন্য জীবন গড়তে গিয়েও আমরা ভুলে যাই না আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সাহিত্য। তাইতো জীবনের স্বপ্নীল অভিযাত্রায় আমাদের কেবলই পিছন ফিরে দেখার পালা, স্মৃতিমন্থনের পালা, সময়ের সরোবরে স্মৃতির পানসীতে উজান বাওয়া- স্মৃতির অলিন্দে দেশ-প্রবাসের স্মৃতিমেদুরতায় আসা যাওয়ার পথ ধরেই আমরা বেঁচে আছি আমাদের এই জীবনে।

অভিবাসী জীবনে আমরা যদিও জীবনকে নতুন করে সাজানোর স্বপ্ন সংগ্রামে রত, কিন্তু তবুও স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার টানে সংগ্রামের বেড়া ডিঙিয়ে প্রবাসেও হচ্ছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চ। শত হলেও শেকড়ের টান! দেশ ছেড়ে বহু মানুষ প্রবাসের মাটিকে আঁকড়ে ধরেছে, বিশেষ করে গত দুই দশকে এই সংখ্যা বেড়েছে অনেক বেশি, যুক্তরাজ্য থেকে শুরু করে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া হয়ে যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত সারা বিশ্ব জুড়ে কয়েক কোটি বাঙালি বসবাস করছে। আর সে বাঙালির সংখ্যায় যুক্ত আছে পশ্চিম বঙ্গের বাঙালিরাও। দুই দেশের বাঙালিই একইভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবন-জীবিকার সংগ্রাম এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা। দুই বাংলার মানুষ তাদের নিজস্ব গণ্ডিতে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াসে এক সঙ্গেও তারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে, যা বৃহত্তর ঐক্যের চেতনায় সামাজিক সেতুবন্ধের এক নান্দনিক বহিঃপ্রকাশ।

এটা অনস্বীকার্য যে দেশে এবং প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চা, এর প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। মুদ্রিত বই থেকে শুরু করে এখন প্রকাশনার জন্য বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল পাবলিকেশন, অর্থাৎ আন্তর্জালিক বা অনলাইন প্লাটফর্ম, লিটল ম্যাগাজিন, অনলাইন পোর্টাল, ফেইসবুক সহ সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকাশনার উন্মুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। অতীতে প্রকাশনার ক্ষেত্র ছিল

গণ্ডিবদ্ধ, যা আজকের প্রেক্ষাপটে বৃত্তের সীমানা পেরিয়ে অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে পৌঁছে গিয়েছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। সাহিত্য চর্চার উন্মুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হলেও এর গুণগত মানের বিষয়টি গভীর আলোচনার দাবি রাখে। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, প্রবাসে লেখকের সংখ্যা বেড়েছে, বাংলা সাহিত্যে তাদের সৃষ্টি প্রবাসী সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত হলেও তা সাহিত্যেরই অংশ এবং প্রবাসী লেখকরাও অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছেন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য।

বৈশ্বিক পরিবর্তনে এগিয়ে যাবার মিছিলে সামিল হবার ধারায় শুধু প্রবাস নয়, দেশে যারা সাহিত্যচর্চা করছেন, তারাও সহযাত্রী হয়ে যোগ দিয়েছেন- এখন ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে সব একাকার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় প্রাবাসী সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়- যেমন দেশের প্রেক্ষাপটে প্রবাসী সাহিত্যিকদের লেখা এবং চর্চাকে একটু ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হতো অতীতে, এখনো তাই। প্রবাসী সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে তারা পরিচিত নয়, এছাড়া প্রবাসী লেখকদের সৃষ্টিশীল কাজগুলো প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহ ছিল না দেশের প্রকাশকদের। তার কারণ হয়তো হতে পারে দেশের পাঠকগণ প্রবাসী সাহিত্যিকদের সঠিক মূল্যায়ন করেনি বা এখনো যথাযথভাবে করছে না। আরেকটি বিষয় হতে পারে যেহেতু প্রবাসের লেখকদের সঙ্গে দেশের পাঠকদের তেমন একটা যোগসূত্র বা সেতুবন্ধ সৃষ্টি হয়নি, তারা দেশের শীর্ষস্থানীয় লেখকদের কাতারে পড়েন না, প্রকাশকদের লগ্নিকৃত ব্যবসা সফল প্রকাশনা হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে। বিগত দশকের প্রেক্ষাপটে বলা যায় সেক্ষেত্রে যৎসামান্য পরিবর্তন এসেছে, তবে এখনো তা পূর্ণ মাত্রায় নয়। প্রবাসী সাহিত্যিকদের এবং তাদের সৃষ্টিকে সঠিক মূল্যায়ন করা এবং দেশের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে প্রবাসের একটি সেতুবন্ধ তৈরি করা ভীষণ প্রয়োজন। কারণ তাঁরা মূলত সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করছে- প্রবাসী লেখকগণ যে পরিবেশ-প্রেক্ষাপটে জীবন-যাপন করেন, তাঁদের যে জীবনদর্শন, অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি, সেই বোধ থেকে প্রবাসী লেখকদের যে সাহিত্য সৃষ্টি, তা দেশের সাহিত্য চর্চা থেকে কিছুটা আলাদা হবে, সেটা বলাই বাহুল্য এবং পাঠকদের জন্য এটি একটি বিশেষ সুযোগ ভিন্ন ধারার বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার, প্রবাসের জীবনধারা, তাঁদের ধ্যান-ধারণা, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, তাদের দর্শন এবং স্বদেশের প্রতি, স্বদেশি সাহিত্যের প্রতি তাদের যে নাড়ির টান, তা উপলব্ধি করার একটি বিশেষ সুযোগ । তাই প্রবাসে যেভাবে এখন সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, তা বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং প্রবাসী সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেশের পাঠকদের, এমনকি প্রবাসী পাঠকদেরও একটি সেতুবন্ধ তৈরি করাটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দেশে হোক আর প্রবাসে হোক, কিভাবে পাঠক সৃষ্টি করা যায়, কীভাবে বই পড়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়, তা গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন এবং পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন, তা না হলে সাহিত্যের প্রতি মানুষের অনীহা বাড়বে দিন দিন, বিশেষ করে আকাশ সংস্কৃতির অদম্য প্রভাবের এই দুঃসময়ে।

প্রবাসের মাটিতে সাহিত্যচর্চা চলছে বিভিন্ন ধারায়, নতুন মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ছে নতুন সৃষ্টিগুলো, যেখানে বিষয়ভিত্তিক বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতা ও অভিনবত্ব রয়েছে, গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে ধীরে ধীরে। কিন্তু আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রযোজন, আমরা প্রায়শই বলে থাকি- আমাদের ইতিহাস, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি তুলে দিতে হবে নতুন প্রজন্মের হাতে, তাদের হাত ধরেই বেঁচে থাকবে বাংলাদেশ আগামীর বলয়ে ইতিহাসের পথ ধরে। বিশেষ করে যদি প্রবাসের নতুন প্রজন্মের কথা বলতে হয়, তাহলে বলব যে প্রবাসের তরুণ প্রজন্মকে আমাদের

সাহিত্যের সঙ্গে, আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সব সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হলে, তাদের মাঝে বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য ছড়িয়ে দিতে হলে প্রয়োজন অনুবাদ সাহিত্য। আমাদের প্রবাসের তরুণ প্রজন্মের জন্য বাংলাসাহিত্যের অনুবাদ ছাড়া তাদের কাছে আমাদের সাহিত্য পৌঁছে দেওয়াটা দুরূহ কাজ। এদিকটাতে আমাদের এখনো অনেক কাজ বাকি, অনেক পেছনে পড়ে আছি আমরা।

একথা প্রায়ই শোনা যায় যে প্রবাসে বসে সাহিত্য রচনা করলে সেটা 'প্রবাসী সাহিত্য' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, লেখকগণ 'প্রবাসী লেখক' হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন। অনেকেই মনে করেন এটা ঠিক নয়, সৃষ্টিশীল সাহিত্যাঙ্গনে এটা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়, কারণ সাহিত্য সে প্রবাসের মাটিতে বসেই রচনা করা হোক বা স্বদেশভূমিতে, তা সাহিত্য। রচনার প্রেক্ষাপট ভিন্ন হতে পারে, ভাবনায় বিশেষত্ব থাকতে পারে, প্রবাস জীবনের ছায়া থাকতে পারে, চিন্তা-চেতনার পার্থক্য থাকতে পারে, রূপক-উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্য তো সাহিত্যই। এটা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালি লেখকদের সংখ্যা অনেক এবং বর্তমানে প্রাবসী অনেক লেখক তাঁদের বই প্রকাশ করছেন একুশের বই মেলায়, বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলা একাডেমিসহ দেশের বিভিন্ন সাহিত্য-সেবী সংস্থা ও সংগঠনগুলোর দ্বারা পুরস্কৃত হচ্ছেন তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির স্বীকৃতিস্বরূপ। তাই প্রবাসী সাহিত্য বা প্রবাসী লেখক হিসেবে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার যুক্তিগ্রাহ্য বা গ্রহণযোগ্য কোন কারণ আপাতদৃষ্টিতে আছে বলে মনে হয় না। প্রবাসী লেখকগণ যদি বাংলা সাহিত্যের অংশ হিসেবে নিজেদের অনুভব করতে না পারেন, তাহলে প্রবাসের মাটিতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা কীভাবে উৎসাহিত করব, অনুপ্রাণিত করব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায়, তা একটু গভীরভাবে ভাববার বিষয় বৈকি। প্রবাসের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলোতে গড়ে ওঠা অনেক বাংলাদেশি সংগঠন ঐকান্তিক প্রয়াস নিয়ে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মাঝে বাংলা ভাষা শিক্ষা ও বাংলা সাহিত্যচর্চার বীজ বপন করে যাচ্ছেন, তারা কীভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের শেকড়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততা অনুভব করবে!

প্রবাসী লেখকদের কলম এখন অনেক উঁচুমানের সাহিত্য সৃষ্টি করছে, আর এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য, প্রবাসী সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের আরো অনুপ্রাণিত করার জন্য, বাংলাসাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য নতুন ভাবনা এবং নতুন উদ্যোগের প্রয়োজন। দেশের সঙ্গে প্রবাসের সাহিত্যকদের একটি সেতুবন্ধ সৃষ্টি না হলে, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ কাজ হবে না। এটাতো সত্যি যে, প্রবাসী হলেও বাংলাদেশ যেমন আমাদের হৃদয় জুড়ে, শেকড়ের টান যেমন আমাদের অস্তিত্ব জুড়ে, তেমনি বাংলা সাহিত্যও আমাদের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত, অবিচ্ছেদ্য অনুভূতির অনবদ্য অনুরণন সেখানে। বাঙালি সে দেশে হোক আর প্রবাসে- সে চিরকাল বাঙালি। বাঙালির স্বদেশপ্রেম কখনো ম্লান হয়না, কারণ আমাদের শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে তাদের রক্ত, যাঁরা '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল, আমাদের শরীরে বইছে তাদের রক্ত, যারা মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে স্বাধীন করেছে মাতৃভূমিকে। সজীব থাক আমাদের দেশকে ভালোবাসার আনন্দ, চির জাগরুক থাক আমাদের বাঙালি আত্মপরিচয়ের অহংকার, বেঁচে থাক স্বদেশের সঙ্গে আমাদের নাড়ির বন্ধন..... কারণ, স্বদেশ আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের শেকড়, আমাদের ভালোবাসা।

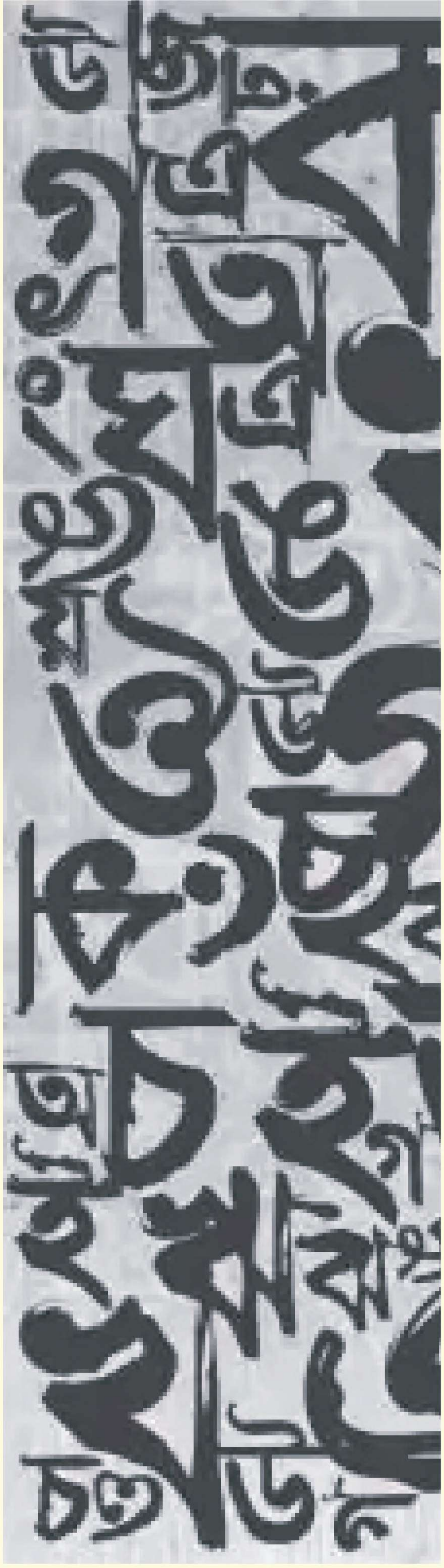

হারালো কোথায় সেই দিনগুলো

তাজনীন আমান

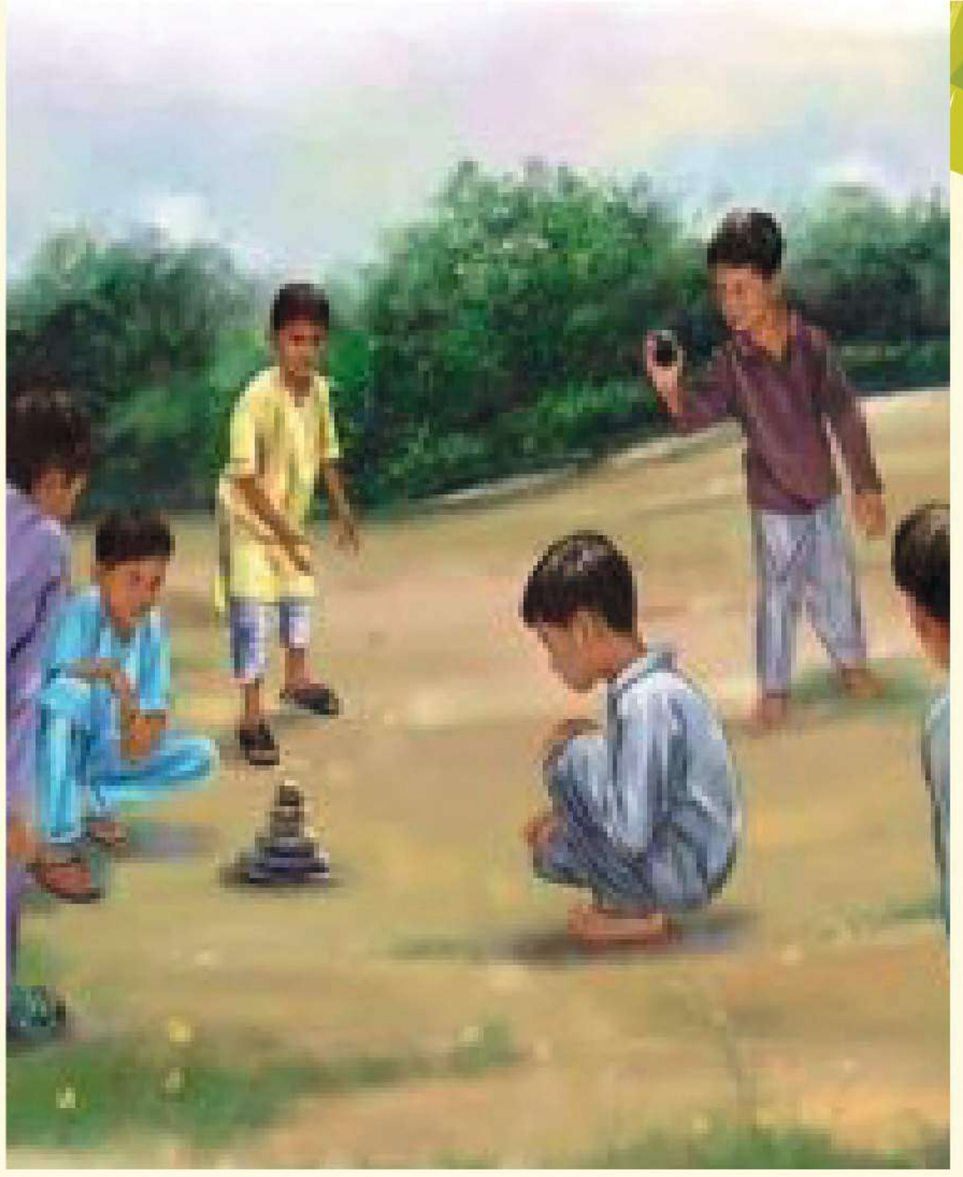

রোজার দিনে ঘুম ভাঙত দাদার ডাকে 'বইনে উঠো রোজা রাখবা না?' তারপর শুনতে পেতাম ঘরের পাশে রাস্তা থেকে মধুর সুরে 'রোজদারো জিন্দারো আল্লাকা পেয়ারো, উঠজাইয়ে ভাই লোগ' এটাকে বলা হতো কাশিদা। কী অপূর্ব! দু'চোখ ভরা ঘুম নিয়ে ভাত খাওয়া। শেষে দুধ-ভাত, কলা দিয়ে মাখিয়ে নইলে মধুরেন সমাপয়াত হবে না যেন। এরপর দোয়া পড়ে ঘুম। কোর্স কমপ্লিট।

লেখাপড়ায় কখনোই আমি ভালো ছিলাম না, তারপরও আমাকে পড়ায় অনুপ্রাণিত করেছেন যে নারী তাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব না। আমার মাতৃসম আন্টি আমাকে শিখিয়েছেন পড়তে, তা শুধু পড়ার বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখতে, যার ফলে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে ঝালমুড়ি খেলেও শেষে ঠোঙ্গাটা খুলে দেখতাম, কী লেখা আছে। আন্টি বলতেন 'পড়ো পড়ো, যত পড়বে ততই জানবে, অবিরত পড়ে যাও। হাতের কাছে যা পাও তাই পড়ো।' সেই থেকে শুরু হলো যাত্রা। পড়তাম না যেনো গোগ্রাসে গিলতাম। বেশির ভাগই গল্পের বই। দাদির কাছে ধরনা দিতাম টাকা দাও তারপর সোজা সদরঘাটের কাছে। ওখানে মাটিতে চটের উপর বিছিয়ে বই বিক্রি হতো। পুরনো গল্পের বই। এক গাদা নিয়ে এসে দম বন্ধ করে পড়ে ফেলতাম সব কটা আবার ছুট। বান্ধবীদের কারও বাসার শোকেসে বই দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যেত। তারপর অনুনয় বিনয় করে সেগুলো নিয়ে আসা, পড়া শেষে আবার ফেরত দেওয়া। আমার জানের জান বান্ধবী নাজমার বাসায় ছিল পুরনো আলমারি ভর্তি অনেক বই কিন্তু তার অধিকারী ছিল ওর বড় ভাই। মহাগম্ভীর আর ভয় পাওয়ার মতো একজন মানুষ। তার সবকটা বইও আমি পড়তে পেরেছিলাম।

একবার একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। আমাকে পড়াতেন আন্টি। সামনেই পরীক্ষা। আন্টি খুব যত্নের সঙ্গে পড়া বুঝিয়ে দিয়ে বলতেন খুব মন দিয়ে পড়, জীবনে অনেক বড় হতে হবে। একটুও ফাঁকি না। বেশ কিছুক্ষণ পর উনি এসে পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, আমি তখন মনের সুখে পাঠ্য বইয়ের আড়ালে গল্পের বই পড়ছিলাম। সেই পরীক্ষায় গোল্লা মারলাম। উত্তম-মধ্যমও বেশ কিছু জুটলো ভাগ্যে।

স্কুল ছিল নারীশিক্ষা মন্দির। সেই খাল পেরিয়ে, রেল লাইন টপকে, হেঁটে হেঁটে যেতাম স্কুলে। টিফিন খাওয়ার স্মৃতি আজো অম্লান। কখন ঘন্টা বাজবে আর বড় এলুমিনিয়ামের বোলে, কখনো বেতের চাঙ্গারীতে করে চলে আসবে লোভনীয় মজাদার টিফিন। সেই রসে টপ টপে গজা, মোহনভোগ আর পুরি। কখনো রসগোল্লা নিমকি। কখনো গড়ম গড়ম সিঙ্গারা। অমৃত সমান। হারাল কোথায় সেই দিনগুলো।

বৃষ্টি এলে যে কী মজা। কাক ভেজা হয়ে বাড়ি ফেরা। একবার বন্যা হলো। আগা সাদেক রোড দিয়ে হাঁটু পানি ভেঙে বাড়ি আসা। আহা কী আনন্দ। এর আগে কিছুদিন পড়েছি কামরুন্নেসা স্কুলে। দাদার পাহারায় যেতাম আসতাম। রিক্সায় দিয়ে যেতেন আট আনা, বাসায় ফিরতেন আট আনা, আবার নিতে আসতেন আট আনা, ফিরে যেতাম আট আনা। তার সঙ্গে যোগ হতো স্কুলের সামনে থেকে কিছু কিনে খাওয়া। একটা হজমীওয়ালা ছিল। ছোট্ট কাগজে হজমী দিয়ে তাতে আবার ফরফর করে আগুন জ্বালিয়ে দিত। হজমীওয়ালার জাদু দেখে তাকে পিসি সরকার বা জুয়েল আইচের সমকক্ষই মনে হতো।

একদিন আমার উপর এক মহাদায়িত্ব অর্পণ করা হলো। স্কুলের বেতন দিবার তারিখ ছিল। আব্বা খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন কী করতে হবে। মনে হয় ১৫ বা ২০ টাকা। স্কুলে যেয়ে দেখি রেজিস্ট্রার সাহেব না আসায় সেদিন বেতন নেওয়া হবে না। স্কুল থেকে ফিরছিলাম হেঁটে হেঁটে। গরমের দিন। রাস্তার পাশে ছালা বিছিয়ে একজন বরফ বিক্রি করছিল। কাঠের গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে রাখা বরফ। মনে হলো এই গরমে বরফ কিনে নিয়ে গেলে বাড়িতে সবাই খুব খুশি হবে। তৎক্ষণাৎ একটা বড় বরফের চাঙ্গর এক লোকের মাথায় তুলে দিয়ে নিয়ে চললাম বীরদর্পে। বাসায় এসে পৌঁছাতেই দাদির সামনে। আমার মুন্ডুপাত করলেন দাদি। তার মাথায় কিছুতেই আসল না যে এত টাকা দিয়ে আমি বরফ কেন কিনে আনলাম। বরফ পড়ে রইল ঐ গলির মাথায়, সঙ্গে আমিও। সারাদিন ধরে ঐ বরফ গলে গলে পানির ধারা বয়ে চলল সঙ্গে আমার চোখের পানি মিলেমিশে একাকার। খুব বই পড়তাম। উপন্যাস। নেশা ধরে যেত পড়তে যেয়ে। প্রত্যেকবারই পড়তে যেয়ে নিজেকে উপন্যাসের নায়িকা মনে হতো। নায়িকার সব সুখ, সব দুঃখ যেন আমার। বড়ো মধুর ছিল শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের দিনগুলো। আর এখন, শুধুই নিজের সঙ্গে সময় কাটানো। কেউ কাউকে সময় দিতে নারাজ। সময় দেবার মতো সময়ই নেই কারও কাছে। ইটস আ লাইফটাইম এক্সপেরিয়েন্স। "আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইলো না কেহ।"

আবৃত্তি কেন করি : আবৃত্তিতে শিল্পীর স্বাধীনতা

রেজা অনিরুদ্ধ

পঠিত রচনার, প্রধানত পঠিত কবিতার ভাব, রস, ক্ষোভ, আক্ষেপ, প্রেম-প্রণয়, দ্রোহকথা ও কবির অনুলেখ্য অন্যান্য তীক্ষ্ণ-তির্যক প্রতীকী বিমূর্ত কথাসমূহ শিল্পী মনে ও মননে ধারণ করেন। সরাসরি অনুল্লেখ্য কিন্তু প্রকারান্তরে কবির অন্তরে ভালোবাসার চূড়ান্ত সরোবর এবং সমাজ-সংসারে শাসক ও শোষকের অত্যাচারে ব্যথিত অগ্ন্যুৎপাত শিল্পী অনুভব করেন।

আধুনিক কবিতায় সনাতন কবিতার মতো নিয়ন্ত্রিত ক্রাইটরিয়া না থাকলেও প্রগাঢ় ভাবনায় শব্দ-বাক্যের বক্তব্যধর্মী বিশেষ প্রয়োগে পাঠকের মনে শিল্পবোধের সৃষ্টি হয়। আবৃত্তিশিল্পী এই শিল্পবোধের প্রকরণগত যোগ-অনুযোগের মাত্রাসমূহ নিবিড়ভাবে আত্মস্থকরণে উদ্যোগী হন।

কবিতার নিহিতার্থ ও বিমূর্তভাবের সারকথা শিল্পী স্বর-প্রক্ষেপণের নিজ নিজ শৈল্পিক ধারায় আবৃত্তি করেন। অনিবার্যভাবে উল্লেখ্য যে, কবিতা পঠনের মতো বাক্যস্থিত শব্দ উচ্চারণ, বিরাম চিহ্ন ইত্যাদির ব্যাকরণগত শুদ্ধতা অবধারিতভাবে মননে রাখা বাঞ্ছনীয়।

আবৃত্তিতে কবির লেখ্যরূপের পরতে পরতে স্থিত কথার গতি সঞ্চারণ শিল্পীর প্রধানতম দায়িত্ব। আর এর অনিবার্য কারণ হলো তা শ্রোতাকুলের মননে পৌঁছে দেওয়া। কবি প্রজন্মের উত্থান, উন্মেষ ও প্রগতির পথকে সুগম করার লক্ষ্যে অগণিত বিমূর্ত সুর ও রঙে কবিতা লেখেন। আবৃত্তিশিল্পী সেই সুরসংগীত দর্শক-শ্রোতা মনকে অবগাহন করিয়ে রঙিন ক'রে তোলেন।

প্রতিটি কবিতাই স্বাভাবিক নিয়মে শিল্প, আবৃত্তিশিল্পী এই শিল্পমাত্রা জ্যামিতিক হারে বাড়িয়ে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা সৃষ্টি করে সাধারণের মনে শিল্পবোধের সঞ্চার করেন। আর এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রজন্ম উচ্ছ্বাসে দ্রুতবেগের প্রগতি। এ কথাও স্পষ্ট বলতে চাই, শিল্প হ'লো তা, যা প্রজন্মের প্রগতি নিশ্চিত করে। আবৃত্তি আমরা সেই শিল্পের কারণেই করি। আবৃত্তির উদ্যেশ্যই তাই।

স্বর-প্রক্ষেপণে আবৃত্তিশিল্পীর স্বাধীনতা- সাধারণত ছন্দ ও মাত্রাবৃত্তীয় কবিতা, বিশেষত বর্ণনামূলক ও নান্দনিকতায় পরিপুষ্ট, এ ক্ষেত্রে ছন্দরীতির নিয়ম মেনেই শিল্পী আবৃত্তি করেন । ছন্দরীতিতে তাল-লয় একটি অনিবার্য বিষয় বটে। ইচ্ছা করলেই ছন্দ ভাঙা যায় না। ছন্দবৃত্তি নন্দনতত্ত্বের দিকও নির্দেশ করে বলা যায়। সৃষ্টিশীল ও নান্দনিকতায় পরিপূর্ণ ছন্দবদ্ধ কবিতার আবৃত্তিতে স্বর-প্রক্ষেপণ আর যাই হোক ছন্দ ভাঙার সুযোগ নেই বললেই হলে। এভাবেও বলা যায় ভাঙার প্রয়োজনও নেই বটে। একটি উদাহরণ দেই, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' এখানে কবি স্বয়ং উল্লেখ করেছেন 'দ্রুত-দাদরা' তালে পড়তে। এই কবিতার উচ্ছ্বাসে সৃষ্টিশীলতার পরম প্রকাশ ঘটেছে। এই কবিতার 'ছন্দ ভঙ্গ' ধারণা বাতুলতার শামিল বলা যায়।

এবার "বিদ্রোহী" কবিতার কথা ধরা যাক! বিদ্রোহী আবৃত্তিতে খুবই কম সংখ্যক আবৃত্তিকার ছন্দবদ্ধ হয়ে আবৃত্তি করেছেন। অথচ এই কবিতাটি চূড়ান্তভাবে ছন্দবদ্ধ একটি কবিতা। আমি বিদ্রোহী কবিতাটি বিশ্লেষণের ধৃষ্টতা দেখাতে চাইছি না। শুধু এটুকু বলছি যে, অচিন্তিত উথাল-পাতাল মাত্রায় ওঠানামা, ছন্দরীতি অক্ষুণ্ন রেখে ভালোবাসা ও দ্রোহের আকাশছোঁয়া সৌরভ ও দিগন্ত ভেদকারী বর্শা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আবৃত্তিতে শিল্পী এখানে যেমন 'ছল ক'রে দেখা অনুক্ষণ'-এ আবিষ্ট হয়ে চূড়ান্ত প্রকাশে একটু 'উচ্ছৃঙ্খল' হতেই পারেন। 'আর্ফিয়াসের বাঁশরী'র সুরে ঘুমভাব আনতেই পারেন। আবার 'পরশুরামের' মতো দুরন্ত দুর্বার প্রকাশে সকল নিয়ম ভাঙতেই পারেন।

'ভগবান বুকে' পদচিহ্ন আঁকতে ছন্দরীতি যত্রতত্রভাবে ভাঙতেই পারেন। এমন দুর্দান্ত, সুদূর পরাহত কার্যকারণ ও জাগতিক ব্যাকরণ পরিহার করতেই পারেন। প্রেম ও দ্রোহে কোনো ব্যাকরণ নেই, এখানে সকলের মতো আবৃত্তিশিল্পীও এমন প্রক্ষেপণে স্বর নিপুণতায় পূর্ণভাবে স্বাধীন। অন্তত এই দুটি ক্ষেত্রের বিধিবদ্ধতা ভাঙা ব্যক্তিভেদে স্ব স্ব যৌক্তিকতায় পরিশুদ্ধ। দ্রোহ ও ভালোবাসায় নিয়ম ভাঙাই সর্বোচ্চ নিয়ম।

এপারে-ওপারে বাংলা ভাষা কোন পারে?

এইচ বি রিতা

২১শে ফেব্রুয়ারি মানেই সেই অতীতে ফিরে গিয়ে ১৯৫২ সাল খুঁজে দেখা। ঢাকার রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা সেই, রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অরো অনেক বাংলার দামাল ছেলেদের কথা স্মরণ করা। সেই সঙ্গে চলে আসে শহীদ মিনার, এপারে-ওপারে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও চর্চার কথা।

নিজ জন্মভূমিতে বাস করে যখন কেউ নিজ মাতৃভাষার পরিবর্তে বিদেশি ভাষায় পড়াশুনা করে এবং কথা বলতে গিয়ে বাংলা ভাষার সুর হারিয়ে ফেলে, তখন বিদেশে জন্ম নেওয়া কিংবা দীর্ঘদিন বসবাস করা কেউ যদি বাংলা ভাষার ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করে, সেটা দোষের কিছু মনে হয় না।

অতি দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, বাংলাদেশে আমাদের নতুন প্রজন্ম বাংলা ভাষার আন্দোলন বা বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে অনেকটাই অনভিজ্ঞ। নতুন প্রজন্ম টম ক্রুজ, জন সিনা, ফুসাজিরো ইয়ামাউচির নাম খুব ভালো করেই জানে, কিন্তু রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অরও অনেক বাংলার দামাল ছেলেদের কথা অনেকেই জানে না। তারা চেয়ার চিনতে পারে, কেদারা চিনতে পারে না। তাদের ভাইব্রেটর সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা আছে, গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ঢেঁকি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তারা ভ্যালেন্টাইনস, কিস ডে, ফ্রেন্ডশিপ ডে সম্পর্কে অবগত, কিন্তু বাংলার মুক্তিযুদ্ধ, যোদ্ধা, ভাষা দিবস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ।

কিন্তু কেন?

কারণ আমরা অভিভাবক হিসাবে আমাদের সন্তানদের নিজ দেশ ও দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, উৎপত্তি সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা দিতে ব্যর্থ। পরিবর্তে আমাদের অনেকেই সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে দিয়ে গর্ববোধ করেন। অর্থ ব্যয়ে সন্তানদের ইংলিশে দক্ষতা বৃদ্ধি করেন যেন দেশের বাইরে গিয়ে তারা আরও উন্নত পদে কোনো চাকরি করতে পারে।

তাতেও কোনো সমস্যা নেই। বর্তমানে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পড়াশুনা ও উপযুক্ত শ্রমের যা মূল্য, তাতে করে শুধু এক ভাষা এবং এক দেশে আটকে থাকাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মানুষ যেখানে মূল্যায়ন হয়, সেখানেই ছুটে। জীবনযাপনের মান উন্নত করতে এই যুগে ইংলিশ ভাষার দরকার আছে।

একটি শিশু ইংলিশ, হিন্দি বা স্পেনিশ যে কোন ভাষাকেই তার দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে, এটি সমস্যা নয়। সমস্যাটি হল যদি তাদের প্রাথমিক মাতৃভাষার উপর সাবলীলতা না থাকে।

আমাদের বাংলা ভাষায় সাবলীলতা না থাকার বড় সমস্যাটি হল, আমাদের দেশে এখনও আমাদের শিক্ষার একটি মানসম্পন্ন বাংলা ভাষী পাঠ্যক্রম পাস করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলে। তাই সাবলীলতা অর্জন করা যায় না। নিজ মাতৃভাষার উপর সাবলীলতা রেখেই আমাদের শেষ পর্যন্ত হিন্দি, স্প্যানিশ, ল্যাটিন, বা ইংরেজি যাই হোক না কেন, তা গ্রহণ করতে হবে।

আমেরিকাতে সরকারি কোনো বাংলা স্কুল নেই। এ দেশের ভাষা ইংরেজি এবং দ্বিতীয় ভাষা স্প্যানিশ। তবে কিছু কিছু রাজ্যে কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন এবং সদস্যদের উদ্যোগে বাংলাদেশি শিশুদের বাংলা শেখানোর লক্ষ্যে 'বাংলা স্কুল' কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে অনেকে ঘরে বসেও সন্তানদের বাংলা বর্ণমালার বই কিনে পড়তে ও লিখতে শেখাচ্ছেন।

বাংলা ভাষার চর্চার কথা বলতে গেলে, এখানকার বাঙালি বাবা-মায়েদের স্যালুট দিতেই হয়। আমাদের অনেক বাবা-মায়েরাই প্রবাসে কঠোর পরিশ্রম করেন। বিশেষ করে, নিউইয়র্ক আমেরিকাতে জীবনযাপন খুব ব্যয়বহুল।

সময়ের কাঁটায় মূল্য দিতে হয় এখানে। সবাই যে বসে থেকে অফিস আদালতের চাকরি করেন, তা নয়। তারপরও অনেক বাঙালি সেই কষ্টে উপার্জিত অর্থে সন্তানদের বিভিন্ন বাংলা শিল্প-সংগীত, যেমন বাংলা গানের স্কুল, বাংলা নাচের স্কুলগুলেতে ভর্তি করান, সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র, পোশাক সবই কিনে নেন। বাঙালি কমিউনিটিতে প্রায়শই বিভিন্ন শিল্প-সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানগুলো হয়, এবং দিনের কর্ম ব্যস্ততা শেষে শিল্প-সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষগুলো ঠিকই উপস্থিত হোন সেই সব অনুষ্ঠানে। ঘরের কাজ, চাকরি, সন্তানের স্কুল সামলানো তারপর ছুটির এক-দুইটা দিন সন্তানের নিয়ে নিজ ভাষা-সংস্কৃতি ধরে রাখার যে আপ্রাণ চেষ্টা আমাদের বাঙালি পরিবারগুলোর, তা বর্ণনাতীত।

একটা বিষয় আমরা এড়িয়ে যেতে পারিনা যে, আমাদের ভাষা শহিদরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত দেশ ও জাতির কাছে তেমন করে মুল্যায়িত হননি। শহিদ মিনার সংগ্রামের প্রতীক, সৃষ্টির প্রতিক, মানুষের আর্থ-সামাজিক সাম্যের প্রতিক। শহিদ মিনার জাতীর মাতৃভাষার প্রতীক। দেখা যায় যে, ২১শে ফেব্রুয়ারি রাতে সবাই ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে পায়ের জুতা খুলে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। বাকি দিনগুলোতে দেখা যায় অনেকেই জুতা পায়ে শহিদ মিনারে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, প্রেমিক-প্রেমিকারা জুটি বেঁধে আড্ডায় মেতে উঠছেন। এগুলো চোখে পড়ার বিষয়।

অনেকেই বলে থাকেন, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষা বর্তমানে বাংলা ভাষাকে হত্যা করছে। কোনো ভাষা অন্য ভাষাকে হত্যা করতে পারে না, এটা করে মানুষ। আজ বাংলা ভাষা যদি তার তাৎপর্য হারাতে বসে, তবে তার একমাত্র দায়ভার বাঙালির। বাংলাদেশের নাগরিকরা যদি মাতৃভাষার পরিবর্তে হিন্দি বা ইংরেজি ভাষাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়, তবে এটি স্পষ্টতই এর তাৎপর্য হারাবে।

বিশ্বের বহু দেশের ফিল্ম এখন বিভিন্ন ভাষায় ডাব করা হচ্ছে যাতে স্থানীয় লোকেরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এই চলচ্চিত্রগুলো উপভোগ করতে পারে। কিন্তু এই ডাবিং বাংলায় করা যায় না, কারণ কিছু বাঙালি মানুষ এটা চায় না। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের কথা বাদই দিলাম, এমনকি তারা চায় না যে-কোনো জনপ্রিয় হিন্দি/তামিল/তেলেগু সিনেমা বাংলায় ডাবিং হোক। কিন্তু সেই তারাই আবার নেটফ্লিক্সে পয়সা দিয়ে হিন্দি, তামিল/তেলেগু ফিল্ম দেখছেন। আর এভাবে তারা বাংলা ভাষার গুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছেন।

আজকাল হিন্দি ভাষাটাও আমাদের অনেকের ভিতরেই বেশ একটা শক্ত অবস্থান গড়ে নিয়েছে। ফেসবুকে অনেকেই হিন্দিতে স্টেটাস দিতে পছন্দ করেন। বিয়ে বাড়িতে সাধারণত হিন্দি গানের প্রচলনটা অনেক আগে থেকেই। এখনকার নতুন প্রজন্ম 'পদ্মা নদীর মাঝি' টাইপ ছবি পছন্দ করেন না। জিসম, রাম লীলা, কামসূত্র টাইপ হিন্দি ছবিতেই রোমাঞ্চ আর থ্রিল খুঁজে পায় তারা।

আর তাদেরই বা দোষ কী? পরিবারে যা দেখবে, যা দেখাবে, সন্তান তাই অনুসরণ করবে। সন্ধ্যা হলেই অনেক মা বসে যান স্টার প্লাস, জি টিভি, জি সিনেমা, বি ফর ইউ চ্যানেল খুলে। তাদের পাশে বসে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও শিখছে নিত্য নতুন হিন্দি ভাষা। বাংলা নাটকগুলোতেও আজকাল দেখা যায়, শাশুড়িকে ডাকছে শাসুমা, বোনকে ডাকছে দি। হিন্দি যেন এখন অনেকটা ড্রাগ এডিকশনের মতোই বইছে আমাদের শিরা উপশিরায়। এই যে নিজের ভাষার প্রতি এত অনীহা, এর দায়ভার কার?

তা ছাড়া, আমাদের এফএম চ্যানেল এবং আরজে সম্পর্কে সবাই অবগত। এফএম চ্যানেলগুলোতে যেভাবে বাংলা আর ইংলিশ মিশিয়ে একটা মিশ্র বিকৃত ভাষা উপস্থাপন করা হয়, তা সত্যিই দুঃখজনক। তাদের এক লাইনের বাক্যে ৬-৭টি ইংলিশ শব্দ থাকতেই হবে। বাংলা শব্দগুলোকে তারা এমনভাবে উচ্চারণ করেন, শুনে মনে হয় যেন তারা জন্মগতভাবে ব্রিটিশ নাগরিকত্বের অধিকারী কিংবা বাংলা শব্দটা তাদের কাছে খুব অপরিচিত।

বাংলা ভাষায় শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে আমাদের কিশোর-তরুণদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। তারা কম সময়ে সব কিছু অর্জন করে ফেলতে চায়। ধৈর্য ধরে গন্তব্যে পৌঁছানোর বদলে তারা খোঁজে শর্টকাট রাস্তা। আজকের কিশোর-তরুণরা বাবাকে বলছে ড্যাড, ভাই বা বন্ধুকে বলছে ব্রো। শব্দের অর্থ না বুঝে বাক্য ব্যবহারে কারও প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে বলছে, 'তুমি বড্ড প্যারা দেও আমাকে।' অথচ একাধিক বাক্যের রচিত গদ্যের অংশ হলো প্যারা। ক্ষুব্ধ অনুভূতির সঙ্গে এই শব্দের কোনো সংযোগ নেই। শুধু তাই নয়, কিশোর-তরুণরা এখন 'শুভ সকাল/শুভ রাত্রি' বলতে ভুলে গেছে। পরিবর্তে দুই অক্ষরে 'GM/GN' ব্যবহারের হিড়িক বেশি।

সেই হিসাবে প্রবাসী বা আমেরিকায় জন্ম নেওয়া, বসবাস করা আমাদের সন্তানেরা অনেক ভালো বাংলা বলার চেষ্টা করে। তাদের প্রাথমিক ভাষা ইংলিশ। ইংলিশে তাদের স্কুল-কলেজের পড়াশুনা শেষ করতে হয়। সেই সঙ্গে তারা পড়াশুনার পাশাপাশি এই যে বাংলা ভাষা এবং বিভিন্ন শিল্প সংস্কৃতি ধরে রাখার চেষ্টা করছে, সেটা অনেক কিছু। হতে পারে অনেক বাচ্চাই ভাঙা শব্দ এবং ধীর গতিতে বাংলা ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে; তারা বাংলা ভাষাকে অস্বীকার করে না।
তবে যদি কেউ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা এড়িয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা তাদের জোর দিতে পারি না। বুঝতে হবে যে, বাংলা আমাদের প্রাথমিক ভাষা হলেও, এ দেশে জন্ম নেওয়া বা ছোট থেকে বেড়ে উঠা আমাদের সন্তানদের প্রাথমিক ভাষা নয়। তাদের ভাষা ইংলিশ। কাজেই তারা সে ভাষাতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।

মূলকথা হলো, বাংলা ভাষা আমাদের বাঙালির প্রাণের ভাষা, মাতৃভাষা। এই ভাষার জন্য রক্তক্ষরণ কম হয়নি। তাই আমাদের নিজ ভাষার শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের প্রতি আন্তরিক ও সাবলীল হতে হবে। তবে বাংলা ভাষা ছাড়া আমরা অন্য কোন ভাষার চর্চা করতে পারবো না, বিষয়টা তা নয়। আমরা প্রয়োজনে দ্বিতীয়, তৃতীয় যে-কোনো ভাষার চর্চা করতে পারি, তবে নিজ মাতৃভাষায় সাবলীলতা বজায় রেখেই আমাদের সেটা করতে হবে। অনুরুপ, প্রবাসীদের ঘরের সন্তানদের প্রাথমিক ভাষা ভিন্ন, বাংলা নয়। অর্থাৎ, বাংলা তাদের দ্বিতীয় ভাষা। কাজেই তারাও নিজ প্রাথমিক ভাষাকেই গুরুত্ব বেশি দিবে, সেটাও মানতে হবে।

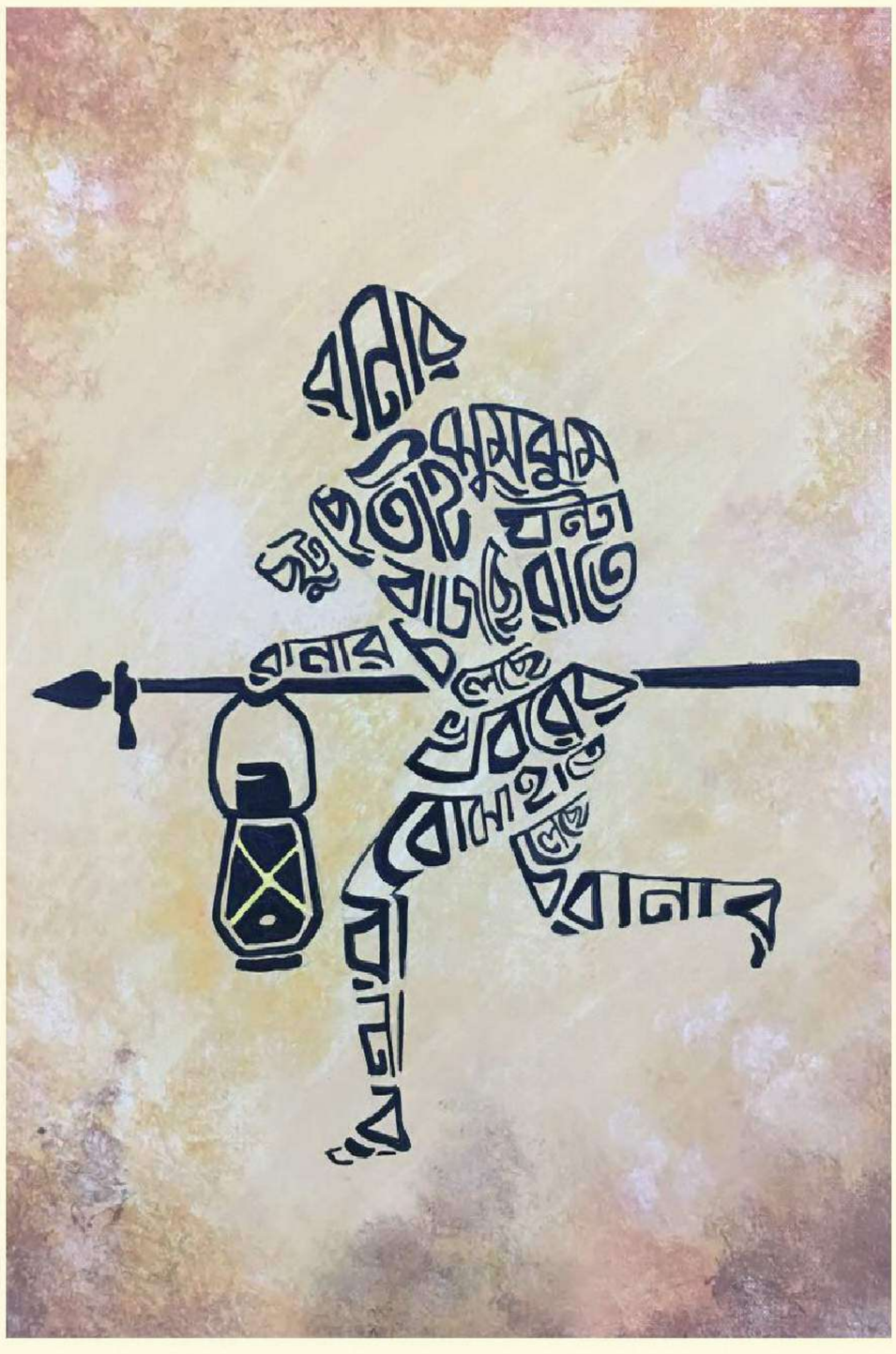

বাংলা ভাষা এখন বিশ্বভাষা

জাহিদা আলম

বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। বাংলা আমাদের প্রানের ভাষা। আমরা দেশে-বিদেশে যেখানেই থাকি বাংলাকে আমরা ধারণ করি অন্তরের অন্তস্তলে। কিন্তু জাতিসংঘ স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এলেই আমরা বাংলাচর্চার একাল, সেকাল, স্থান, কাল, পাত্র নিয়ে লেখালেখিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমি মনে করি সেটারও একটা ভালো দিক আছে।

আমরা মানবাধিকারের বিষয়টি সামনে রাখার জন্য যেমন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন করি, নারীদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধার কথা মনে রাখতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করি। এমনি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিবসের মতোই বাংলা ভাষা যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে সেটা আমাদের জন্য অনেক অহংকার আর গর্বের বিষয়।

আমরা যারা প্রবাসে থাকি, তারা জীবনের প্রয়োজনে কিংবা বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সব সময় হয়তো বাংলায় কথা বলতে পারি না। সেটা সম্ভবও না। কিন্তু তারপরও বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আমরা যে অনেকদূর এগিয়েছি তার অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমি এ প্রসঙ্গে দু'একটি কথা তুলে ধরতে পারি। যেমন বিশ্বের অনেক গৃহযুদ্ধ কবলিত দেশের অনেক জনগোষ্ঠীর কাছে বাংলা একটি জনপ্রিয় ভাষা। কারণ সেসব দেশে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষাবাহিনী কাজ করছে, ওইসব দেশের মানুষ অনেকেই এখন বাংলায় কথা বলে।

জাতিসংঘে বাংলাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেওয়া যেমন আমাদের জন্য গর্বের, তেমনি ভিন্ন কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্টীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়াটাও আমাদের জন্য, আমাদের ভাষার জন্য সম্মানের। যেমন আমরা সিয়েরা লিয়নের কথা বলতে পারি। পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন দেশ। সেখানে বহু বছর গৃহযুদ্ধ হয়েছে। জাতিসংঘের অধীনে সেখানে শান্তিরক্ষী বাহিনী কাজ করছে। বাংলাদেশি অনেক সেনাসদস্যও দায়িত্বরত রয়েছেন। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষা বাহিনীর কাজের স্বীকৃতি দিতে সেখানে ২০০২ সাল থেকে বাংলাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বাংলা একসময় বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এখন বিশ্বের বহু দেশে বাংলা ভাষা নিজের পরিচয় খুঁজে পেয়েছে। বর্তমান বিশ্বে বাংলা হচ্ছে পঞ্চম বৃহত্তম ব্যবহৃত ভাষা। সারা দুনিয়াতে ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ বাংলায় কথা বলেন। যার মধ্যে কেবল বাংলাদেশেই রয়েছে প্রায় ১৭ কোটি মানুষ। বাদ বাকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কলকাতাসহ কয়েকটি রাজ্যে আংশিকভাবে, পাকিস্তান, সিয়েরা লিয়নসহ অনান্য জায়গাতেও বাংলা ভাষাভাষী মানুষ রয়েছে। যে ভাষার জন্য সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারকে গুলি করে হত্যা করেছিলো পাকবাহিনী, সেই পাকিস্তানের করাচিতে কিন্তু ২০ লাখেরও বেশি মানুষ বাংলায় কথা বলে। করাচি সিটি করপোরেশনের অন্যতম ভাষা বাংলা। সুতরাং ১৯৪৭ সাল থেকে ভাষার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিলো সেটার চূড়ান্ত পরিনতি লাভ করে ১৯৫২ সালে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা আজ বিশ্বের সর্বত্র পতপত করে উড়ছে তার বীজ বপন হয়েছিল ভাষার দাবিতে বিদ্রোহ করার মধ্য দিয়েই। সুতরাং অনেক দীর্ঘ সময় না হলেও মাত্র ৫০ বছর আগে জন্ম নেওয়া একটি রাষ্ট্রের ভাষা সারা পৃথিবীতে তার নিজের মহিমাতেই ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে।

প্রবাসে বাংলা ভাষার গুরুত্ব যে বাড়ছে তার আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন যুক্তরাজ্যে সে দেশের স্বীকৃত ভাষার মধ্যে বাংলাভাষা ৫ম। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কুইন্সেও এখন অফিস আদালতে বাংলা ভাষা একটা জায়গা করে নিয়েছে। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যালট পেপারে বাংলা ভাষার ব্যবহার হচ্ছে। বাংলা ভাষায় সিটির বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রচারণা চলছে সেটাও লক্ষণীয়। এটা আমাদের জন্য একটা সুখানুভূতিও বটে।

নিউইয়র্ক ছাড়াও ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস, মিশিগানের ডেট্রয়েট ও হ্যামট্রামিক, নিউজার্সির প্যাটারসন, আটলান্টিক সিটি, পেনসালভেনিয়ার আপার ডারবি এবং ফিলাডেলফিয়াতে বাংলা ভাষার প্রচলন রয়েছে সরকারিভাবে। বিশেষ করে ভোটের ক্ষেত্রে ব্যালট পেপারে বাংলাতেই লেখা থাকে প্রার্থীদের নাম। বাংলার প্রচলনে প্রবাসে যারা বয়স্ক মানুষ রয়েছেন, যারা ভালো ইংরেজি বুঝেন না, তাদের জন্য ভোটসহ অন্যান্য কাজে অনেক ইতিবাচক সুবিধা হচ্ছে। সুতরাং এটা সহজেই অনুমান করা যায় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা ভাষা একটা মর্যাদার আসনে জায়গা পেয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষতে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বসবাস সেখানেও একই ধরনের পদক্ষেপ দেখা যাবে।

অফিস-আদালত বাদ দিলেও আমরা যদি প্রবাসে বাংলা ভাষার চর্চার বিষয়ে কথা বলি তাহলেও আশাবাদী হওয়ার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। বাংলা ভাষাকে প্রবাসে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেকেরই প্রচেষ্টা চোখে পড়ার মতো। নিউইয়র্কে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত বেশ কয়েকটি স্কুল রয়েছে যারা শিশুদের বাংলা ভাষা শেখাতে সাহায্য করছে। নিউইয়র্ক ছাড়াও অন্য আরও কয়েকটি স্টেটেও এ ধরনের স্কুল রয়েছে। এখানেও বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রবাসীদের সদিচ্ছার প্রমাণ পাওয়া যায়। নতুন প্রজন্মের অনেক ছেলে মেয়েকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে বাংলায় জাতীয় সংগীত বা গান গাইতে দেখা যায়।

যে ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে সেই ভাষা এখন আর কেবল আমাদের একার ভাষা নয়। এটা এখন বিশ্ববাংলার ভাষা। সারাবিশ্বের ভাষা। এই ভাষা আমাদের মায়ের ভাষা। এই ভাষা আমাদের ভালোবাসার ভাষা।

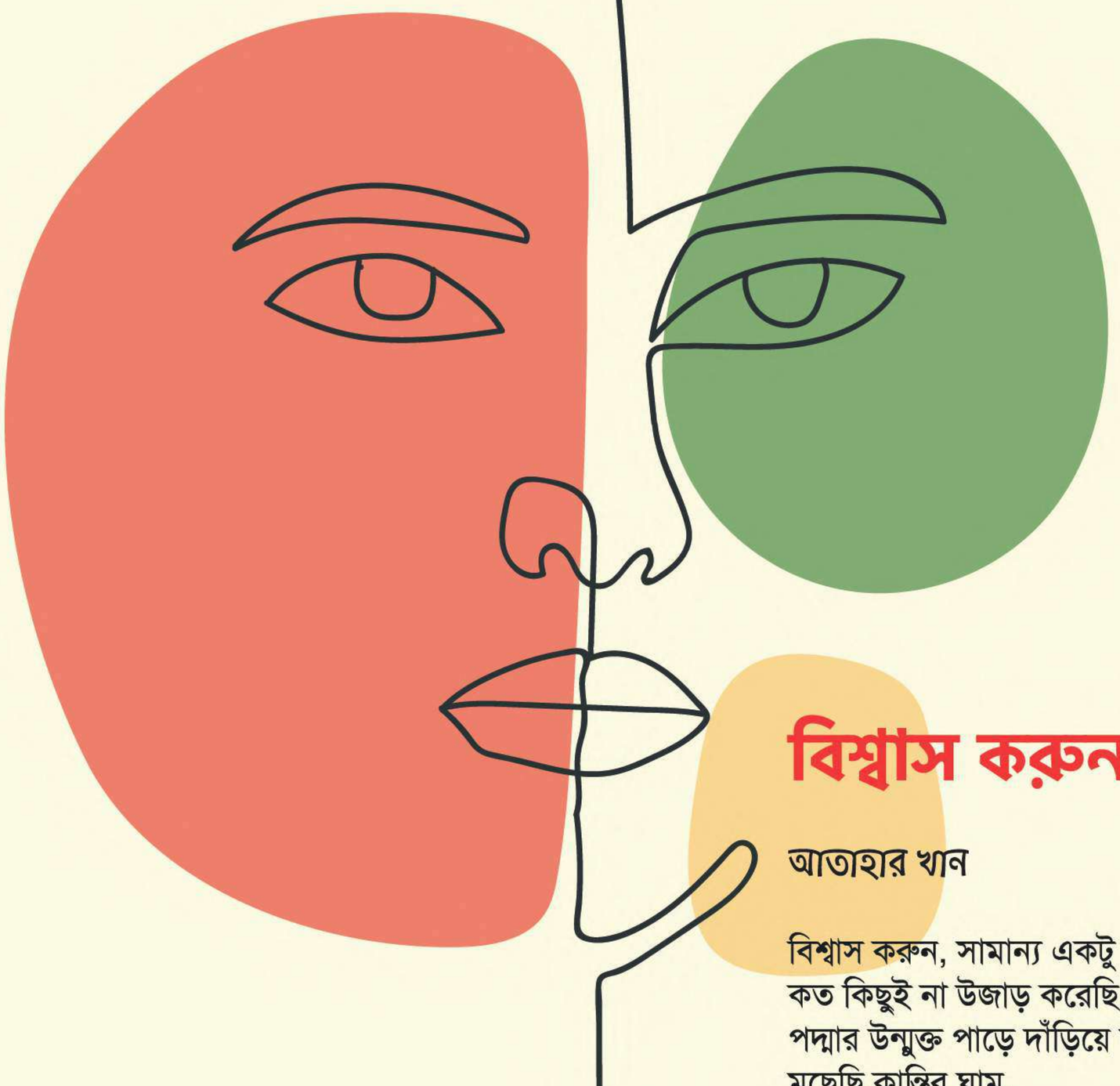

বিশ্বাস করুন

আতাহার খান

বিশ্বাস করুন, সামান্য একটু ভালো থাকবার জন্য
কত কিছুই না উজাড় করেছি,
পদ্মার উন্মুক্ত পাড়ে দাঁড়িয়ে বাতাস মেখে
মুছেছি ক্লান্তির ঘাম,
গভীর জলের ওমে ধুয়ে বিদায় করেছি ক্রোধ আর
প্রখর রোদের তাপে পুড়িয়েছি লোভ;
তারপর শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে শুরু
উৎকণ্ঠামুক্ত জীবনের দিকে পথ হাঁটা!
থেকেছি সর্বদা সৎ, কাউকে ঠকাবো
সেই চিন্তা স্বপ্নেও দেইনি স্থান,
শান্তি ও মঙ্গল কামনায় কত জায়গায় করেছি ভ্রমণ,
কিন্তু খুব কষ্ট পাই নিজ চোখে
যখন দেখতে হয় শান্তি আলোচনা শেষে
আড়ালে লুকায় মানবাধিকার,
সামাজিক রীতি ভেঙে ব্যক্তিস্বার্থ
হয়ে ওঠে প্রতিপক্ষ দমনের নির্ভুল অস্ত্রের উপাদান,
তখন নিজেকে আর স্থির রাখতে পারি না!
নেই কোনো নিয়মমাফিক সহিষ্ণুতা,
নেই স্বস্তি, শুধু বৃষ্টির ফোঁটায়
ভর করে নেমে আসা অস্থিরতা
নিবিড় সম্পর্ক ভেঙে আতঙ্ক ছড়ায় চারদিকে
আর ডেকে আনে মধ্যরাতে ভয়াবহ রক্তপাত!
এই সব দেখে শান্তিকামী মানুষেরা
অহিংসার বাণী ভুলে গিয়ে জাদুঘরে ঝিমুচ্ছে এখন!

কবরের দশতলা

সালেম সুলেরী

শহরের ওপরেও আরেক শহর ভেসে ওঠে
ফ্লাইওভারেও ভাসে ততোধিক যাত্রাপথ, যে রকম উঁচু উঁচু ফ্লাটে ভাসে পাখি-সংসার।
মেঘ-হাওয়ার সাথে গলাগলি ছোঁয়াছুঁয়ি আর মাটি ভুলে যায় মাটির মানুষ।
পায়ের অতল করতল শুকতলা চেনে, মোজার গন্ধকেই ভাবে জননী সুঘ্রাণ।
অথচ মাটির কি সুগন্ধ, সবুজের ছায়াপট সব ছায়া ছায়া অনুভব।
মাটির মানুষ জানো মাটির অধিক বাড়ে শরীরে ওজনে।
মানুষের সব মুখর পা একসাথে মেলবে জমিনে-- এমন চত্বর
কই এই শ্যামল নগরে? দেওয়ালে ঠেকাই মাথা, কবরের
ওপর কবর পড়ে অতিমারীকালে। শ্মশানের ধুলো চাটে নতুনের হাড়গোড়।
মাটির মানুষ আজ মাটিতে শয়ন নিয়ে বড়োই ভাবিত।

পরিশুদ্ধ পরিভূমি নেই পবিত্র আত্মার আলিঙ্গনে, মাটির অভাবে শেষে
ফ্ল্যাটের আদলে গড়ি কবরের দশতলা! বেকার দু'হাতে দেই নতুন বাণিজ্য—
'রিয়েল এস্টেট অব গ্রাভিয়ার্ড...'জিন্দা কবরের নিন্দাবাদ নয়, উঁচু তলার স্বপ্নবাদীরা
হাইরাইজ্ কবরেই খুঁজে নিক ঘুড়ি-ছেঁড়া লাটাই প্রশান্তি!
আর যারা যারা পাদুকাবিহীন, মিশে থাক তৃণমূলে, সমতলে-জন্ম-মৃত্যুমাখা
কোলে-পিঠে, খুব স্বাভাবিক স্থল-জাহাজের আলমিরা মাটিঘরে।

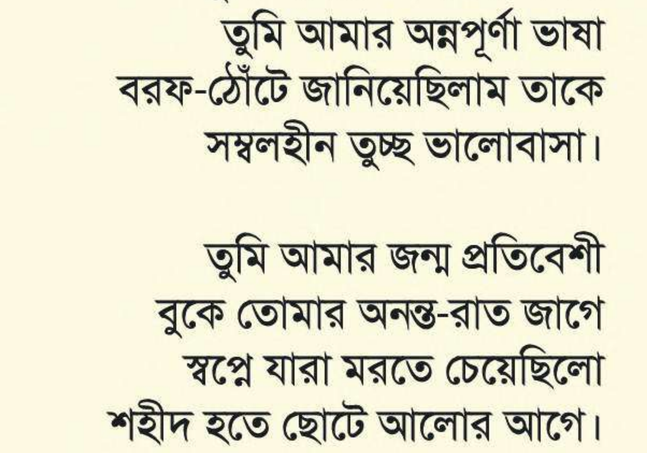

ভাষাজ্বর

সৌমিত বসু

তুমি আমার শেখানো অক্ষর
তুমি আমার অন্নপূর্ণা ভাষা
বরফ-ঠোঁটে জানিয়েছিলাম তাকে
সম্বলহীন তুচ্ছ ভালোবাসা।

তুমি আমার জন্ম প্রতিবেশী
বুকে তোমার অনন্ত-রাত জাগে
স্বপ্নে যারা মরতে চেয়েছিলো
শহীদ হতে ছোটে আলোর আগে।

আমি তোমার ছাত্র হয়ে শিখি
মায়ের ভাষা আগলাতে হয় কেন।

বিহঙ্গ বাসনা

ফেরদৌস সালাম

আমার সান্নিধ্যে এসো তুলে দেবো আনন্দ সবুজ
কপালে কাব্যের টিপ তালু জুড়ে রঙিন ফড়িং
বুকের গহীনে ঢেউ তুলবেই হরিণাক্ষী শিঙ
আঁচল ভরিয়ে দেবো জোছনার অলীক গম্বুজ।

বিনিময়ে দিয়ো তুমি হৃদয়ের স্নিগ্ধ তোলপাড়
শরৎ-বাতাসে দিও ঘুম-চোখ মেঘের আফিম
প্রিয় হাতে বুনে দিও লাউ আর কালো রঙ-সিম
আমার নদীতে দিও তীর ভাঙা অবাধ সাঁতার।

আমিও যে প্রেমে চাই কৃষ্ণ রাধা সুতীব্র আবেগ
হাসন রাজার গানে আলোড়িত সুরমার জল
ভেতরে কঠিন নেশা কী দারুণ সমুদ্র উচ্ছল
নীলিমার নীপবনে আসুক সে ছান্দসিক মেঘ।
সবুজ সান্নিধ্যে এসো গালে তিল উড়ুচুল নারী
বিহঙ্গ বাসনা নিয়ে দেবো এই ভব নদী পারি।

অনাবশ্যক

নাসরীন নঈম

দিবস ও রাত তোমার কাছেই মনটা পড়ে থাকে
তাকে আমি রোজ ছেড়ে দিই ফাগুন হাওয়ার ডাকে।

গেরস্হালির ফাঁক-ফোকরে লিখি তোমার নাম
এই নামে তো সারা বছর পত্র পাঠাতাম|

কী যে বলো একটি খামও পাওনি তুমি বুঝি
হারিয়ে যাওয়া খামগুলি আজ কোথাও বলো খুঁজি।

ধানের ক্ষেতে অনেক পাখি
উদাস চোখে তাকিয়ে থাকি
একটি পাখি খুব বাদামি —-
ভাবতে ভাবতে বিকেল হলে একটুখানি থামি|

ভুল রাস্তায় হাঁটতে গেলে হোঁচট খেতেই হবে
ভাববো না আর তোমার কথা, ভুলে যেও তবে|

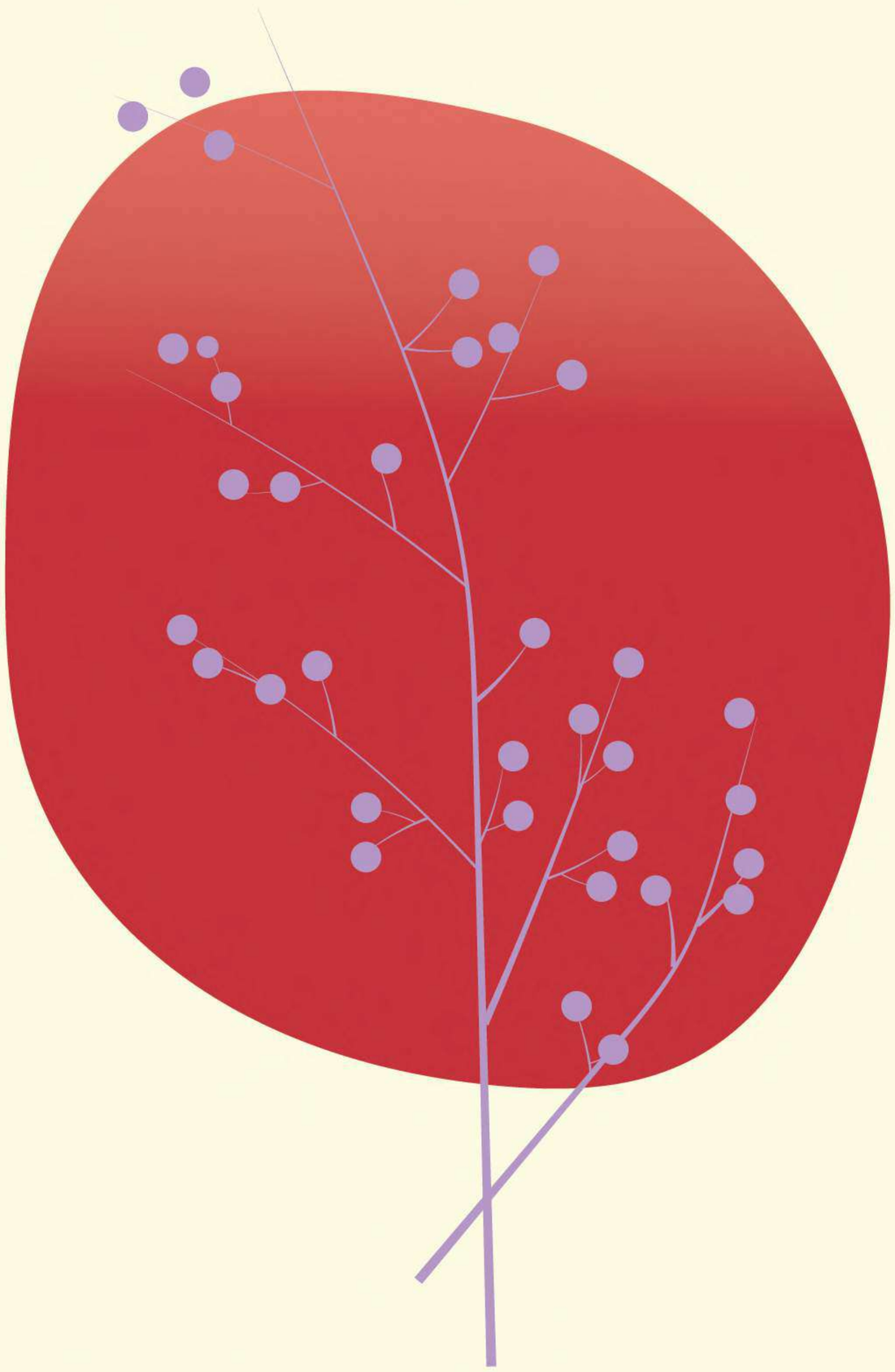

অসমাপ্ত প্রেমের কবিতা

খসরু পারভেজ

সুদূর এথেন্স, খাজুরাহো আর হৃদয়পুরের বাঁকে--
অজন্তা থেকে ইলোরার পথে পথে খুঁজে ফিরি প্রেম!
অনন্তিকা হে! কতটুকু কাছে এলে ভালোবাসা হয়,
কতদূর আর হেঁটে গেলে বলো আরশিনগর পাবো!

নদীর জন্য সাগরের মত নিজেকে উজাড় করে
দিয়েছি তোমাকে, হাতে হাত রেখে বুকের কোঠরে বুক,
চোখে চোখ রেখে চোখের ভেতরে গড়েছি চক্ষুকাল !
ঠোঁটের গভীরে বুনেছি অযুত ফুলের শস্যখেত,
ঝিনুকের দেহে মুক্তোর মত জাপটে নিয়েছি সব,
মেঘের কান্না বৃষ্টির মত অঝোরে ঝরেছি আমি;
তবুও বুঝিনি স্বপ্ন ছুঁয়েছে কখন বেদনা-বন!

বেহুলা জীবন অবোধ্য স্রোতে ভেসে যায়,ভেঙে যায়;
বলো,কতটুকু কাছে এলে প্রেম আসে,ভালোবাসা হয়!

জীবন জমিন জুড়ে দুপুরের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস!
চুরি হয়ে যায় বসন্তগুলো ! কুহক কাব্যকাল !
ফুলহীন সব ফাগুনের দিন, দুঃসহ কালোরাত !
কষ্টকলমে তোমাকে পাবার জন্য কবিতা লিখি।

তুমিই ভেনাস, ট্রয়ের পোড়ানো প্রত্নচিহ্ন নিয়ে
বুকরে ভেতরে গড়েছ প্রেমের ঘর ! তবুও তো আমি
হোমারের মত অন্ধ দুচোখে তোমাকেই খুঁজে ফিরি !

পুলক বারান্দা

মামুন জামিল

পাহাড় চূড়ায় মত্ত খেলায় দুরুদুরু বুক
রহস্যময় গুহায় খুঁজি প্রমত্ত সব সুখ
সুখের ঘোরে ডুবসাঁতারে দুরন্ত কৌশল
রপ্ত হবার আগেই দেখি বিরানভূমে জল।

জলের তোড়ে কাত হয়েছি রাতকে ভাবি দিন
দিনের কাছে রয় না দেনা রাতেই থাকে ঋণ
'ঋণখেলাপী' অপবাদ এক মাথায় নিয়ে হায়
সারাটা রাত উজাড় করি পুলক বারান্দায় !

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেম

শ্যাকিল রিয়াজ

হেঁটেই এসেছি পথ এতোদূর দুঃসহ পা-ব্যথা লুকিয়ে রেখেছি পায়ে,
পাজামার লাল-শাদা পাড়ে অবসন্ন গৃহদাহ চুপচাপ পিছে ফেলে এসে
তুমিও দেখবে, কিছু অপরূপ রোদ জমা ছিল শহরের কাকডাকা মহল্লায়
ঝাঁ ঝাঁ বারান্দায় ছোটখাট ফ্রকগুলো শাড়ি হয়ে দুলছে যেখানে।
শহর কতটা দূর? ভোর হলো আমাদের এই পদযাত্রার ব্যাকুল জিজ্ঞাসায়।
শহর কি এলো? কুয়াশার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বিলবোর্ড আলো
পথের দুধারে খাড়া ছোট ছোট বিজ্ঞাপন বোর্ড বড় থেকে বড়তর হতে থাকে।
সেই মতে বুঝি শহর এসেছে কাছে। শিরদাঁড়া চমকিত হয় অনিশ্চিত
ক্রন্দনের গুন গুন বিরহ সঙ্গীতে শহর এসেছে
প্রিয় এসে গেছি নগরের মোড়ে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু প্রেম অসম্পূর্ণ ভালবাসাবাসি
পাড়াতে মহল্লাজুড়ে এলোমেলো করে রাখা ছিল
তার ঘ্রাণ নিতে আজ অন্ধকারে এসেছি শহরে
জেগে আছো প্রেমগুলো? তোমাদের কুড়াবো দুহাতে।

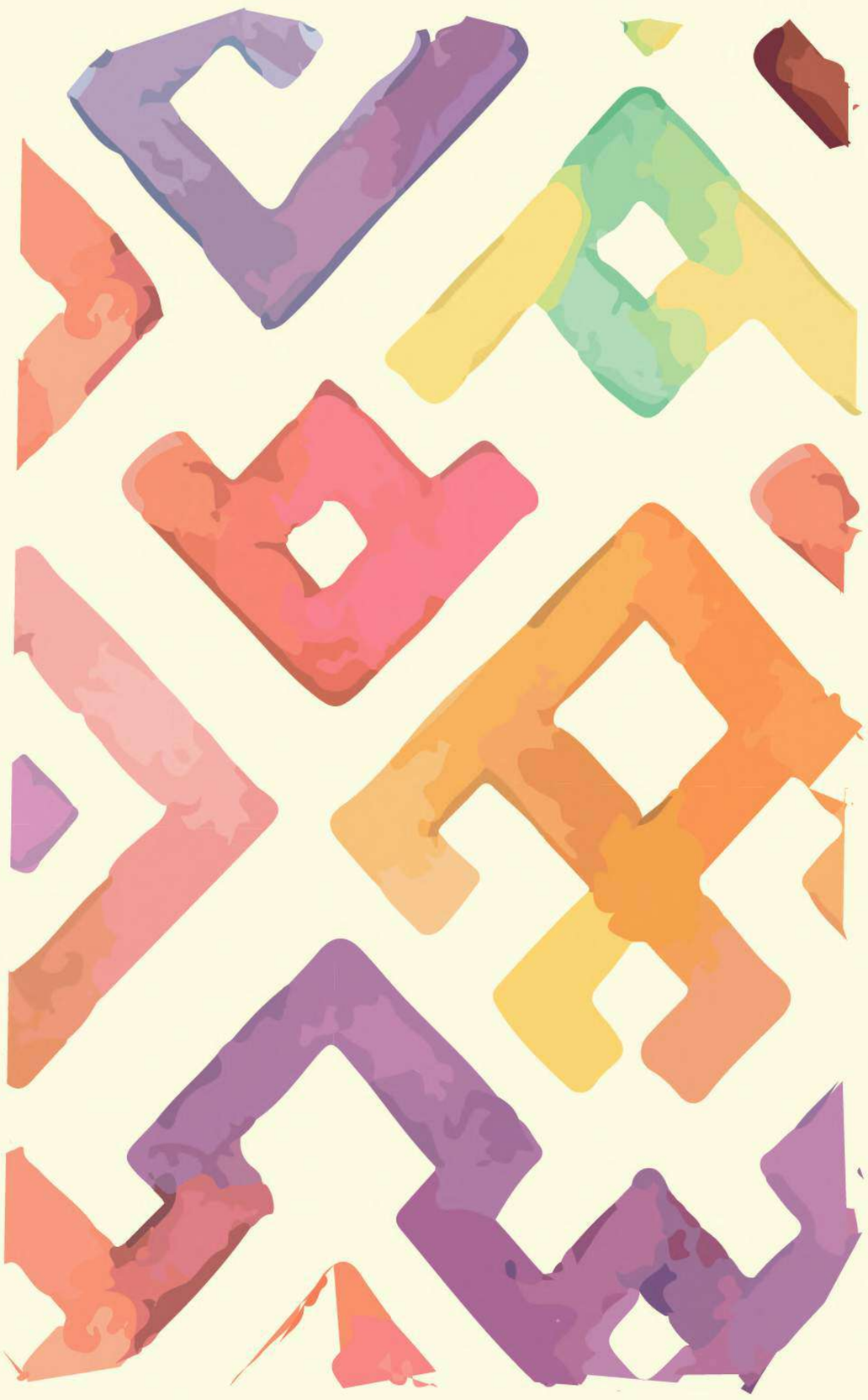

কথার আনন্দ তাঁদের জীবনে নয়

বাদল ঘোষ

বৃষ্টির নির্যাসে বিমুগ্ধ কথারা ঝরে
বলিষ্ঠ কথারা শিশুকন্ঠে
অমিত আনন্দ ধারাপাত
উচ্ছল কথারা দিগন্তে ওড়ায় চিরায়ত
সবুজ পতাকা

সমূদ্র মিছিলে উত্তোলিত অজস্র ইস্পাত

তুমুল কথার বলিষ্ঠ শ্লোগানে
সুনামি জোয়ার পিচঢালা রাজপথে
অতঃপর রক্তগঙা প্রিয়তম মহান কথার
অমল হৃদপিন্ড চিঁরে

কথারা আমার আত্মপরিচয়
কথারা আমার জননী স্বদেশ
কথারা আমার স্বাধীনতা
কথারা আমার ভালোবাসা
কথারা আমার প্রাণের কবিতা

মহান আনন্দে আমি অনিন্দ্য কথার
শুদ্ধ মালা গাঁথি
পরম আত্মায় ওড়ে শান্তির অমোঘ প্রজাপতি
জরাগ্রস্ত সমূহ কথাকে সযত্নে বিমুক্ত করি
অশ্লিল বন্ধন থেকে
ভালোবেসে মোহন কথার
বিমূর্ত আলপনা আঁকি রমণীয় লাবণ্য শরীরে

কখনো গভীর নিমগ্ন অবগাহন
জলজ আত্মায়
অপার্থিব প্রশান্তির বাঁশি বেজে ওঠে
অপার দিগন্ত জুড়ে

প্রাপ্তির দারুণ মোহে পবিত্র কথার
করে যারা সস্তা বিজ্ঞাপন -
কারণে বা অকারণে অলীক রঙচঙা
নির্লজ্জ ফেষ্ঠুন ওড়ায় বাতাসে ...

অভাগা তাদের জন্য ভীষণ আমার মায়া হয় ...
কথার আনন্দ তাঁদের জীবনে নয়

কথার অমোঘ মুক্তি নেই তাঁর কবিতায়
কথারা কয়েদ খাটে
অমল কথারা খাঁচার পাখির মতো
ছটফট ঝাপটায় ডানা ...

পুড়ে যাচ্ছ

তূয়া নূর

কৃষ্ণচূড়ায় ভেসে যাচ্ছে নদী
লাল হয়ে গেছে পানি
লাল পাপড়ি গুলো পানিতে পুড়ে গলে যাচ্ছে
রক্তের রঙে ঢেউ হয়ে ভেসে যাচ্ছে।

হুবহু একই রকম স্বপ্ন দিনের পর দিন কেউ দেখে?

নৌকার পাটাতনে শুয়ে আমি
তোমার কোলে মাথা।
নৌকার তল পুড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে
আগুনে কাঠ পোড়ার মতো শব্দ
গন্ধ আসে নাকে
উঠছে ধোঁয়া।
তুমি যেন এক অচেনা ভাষায় বলছো,
পুড়ে যাচ্ছি আমরা, আছো কেউ সাহায্য করবার!
কেউ নেই আশে পাশে।
কিছুক্ষণ আগেও ছিলো
যখন বসেছিলাম ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে।
এক কিশোর বাদামওয়ালা এসেছিলো
বকুল ফুলের মালা নিয়ে এসেছিলো বেগুনী ফ্রক পড়া এক অন্ধ মেয়ে।

নৌকার পাটাতন ছুঁই ছুঁই
গরম ভাপ এসে লাগে
পানিতে পুড়ছে সব
পানিতে অদৃশ্য আগুন,
তোমার আমার শরীর পানিতে পুড়ে যাচ্ছে
গায়ের চামড়া জ্বলছে
গায়ে যেন কেউ ঢেলে দিচ্ছে ঘন সালফিউরিক এসিড
পুড়ে যাচ্ছে পা
পুড়ে যাচ্ছে গোড়ালি
গলে যাচ্ছে হাড়
ডুবতে ডুবতে পুড়তে পুড়তে
গলে গলে সব মিশে শান্ত হচ্ছে পানিতে
দু'জন দু'জনকে জড়ায়ে ধরে
ডুবে যাচ্ছি রক্তের মতো লাল পানিতে
সেই পানি নাক ছোবার আগে প্রতিদিন ঘুম ভেঙে যায়।

আমার ঘুমাতে ইচ্ছে করে না।
আমার কাছে নির্ঘুম দিন-রাত্রিই ভালো।

মাতৃভাষা বাংলা

তাহমিনা সুলতানা

বাংলা আমার আকাশ মাটি
বাংলা মায়ের শীতল পাটি
চেনা ফুলের গন্ধে ভরা
স্বপ্নমাখা আবেগ কাড়া

মনের সকল কল্পকথা
বলতে থাকি নিজের মতো
আশার প্রদীপ নিভে গেলে
বাংলা এসে গল্প বলে

বাংলা আমার কে হয় বলবো?
বাংলা ছাড়া কেমনে চলবো
অন্য ভাষা পরের বুলি
বাংলা সাধের রং-এর তুলি

মিষ্টি মধুর বর্ণমালা
বাংলা কথায় জুড়ায় জ্বালা!

আমার বাংলাদেশ

মারজানা সাবিহা শুচি

আমার বাংলা, আমার স্বদেশ, আমার জন্মভূমি,
ভালবাসা তুমি, বুক ভরা প্রেম, সোনালি স্বপ্ন তুমি।
দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠে সবুজের হাতছানি,
উদাসী বাতাসে গাছে গাছে ভাসে পাতাদের কানাকানি।
শাখে শাখে পাখি সুরে ডাকাডাকি, সাঁঝবাতি জ্বালে জোনাকি
আকাশে পাহাড়ে, সাগরে নদীতে কত মায়া আছে মাখি!
ঐশ্বর্যের অঢেল সাগরে ভাসি না আমরা, তবু
আমরা তো জানি লড়তে, আমরা হারতে শিখিনি কভু।
আছে দারিদ্র, দুঃখ, বেদনা, বেঁচে থাকবার রণ
তবুও স্বদেশ তোমার বুকেই মাথা রাখবার পণ।
খরার আগুন পোড়ায় ফসল, বর্ষায় হানে বান,
তবুও আমরা লাঙ্গল চালিয়ে ফলাই সোনার ধান।
নদীতে সাগরে ঘূর্ণি তুফান ডোবে নাও ভাঙ্গে হাল,
জেলেদের জালে তবু ঝলকায় রুপালি মাছের পাল।
যেমন এনেছি রক্তিম পথে বাংলার স্বাধীনতা
তেমনি লড়েই লিখবো মোদের এগিয়ে চলার গাঁথা।
শ্রমিকের শ্রমে, মজুরের ঘামে তিলে তিলে গড়ি দেশ,
একদিন রবে সেরাদের দলে আমার বাংলাদেশ।

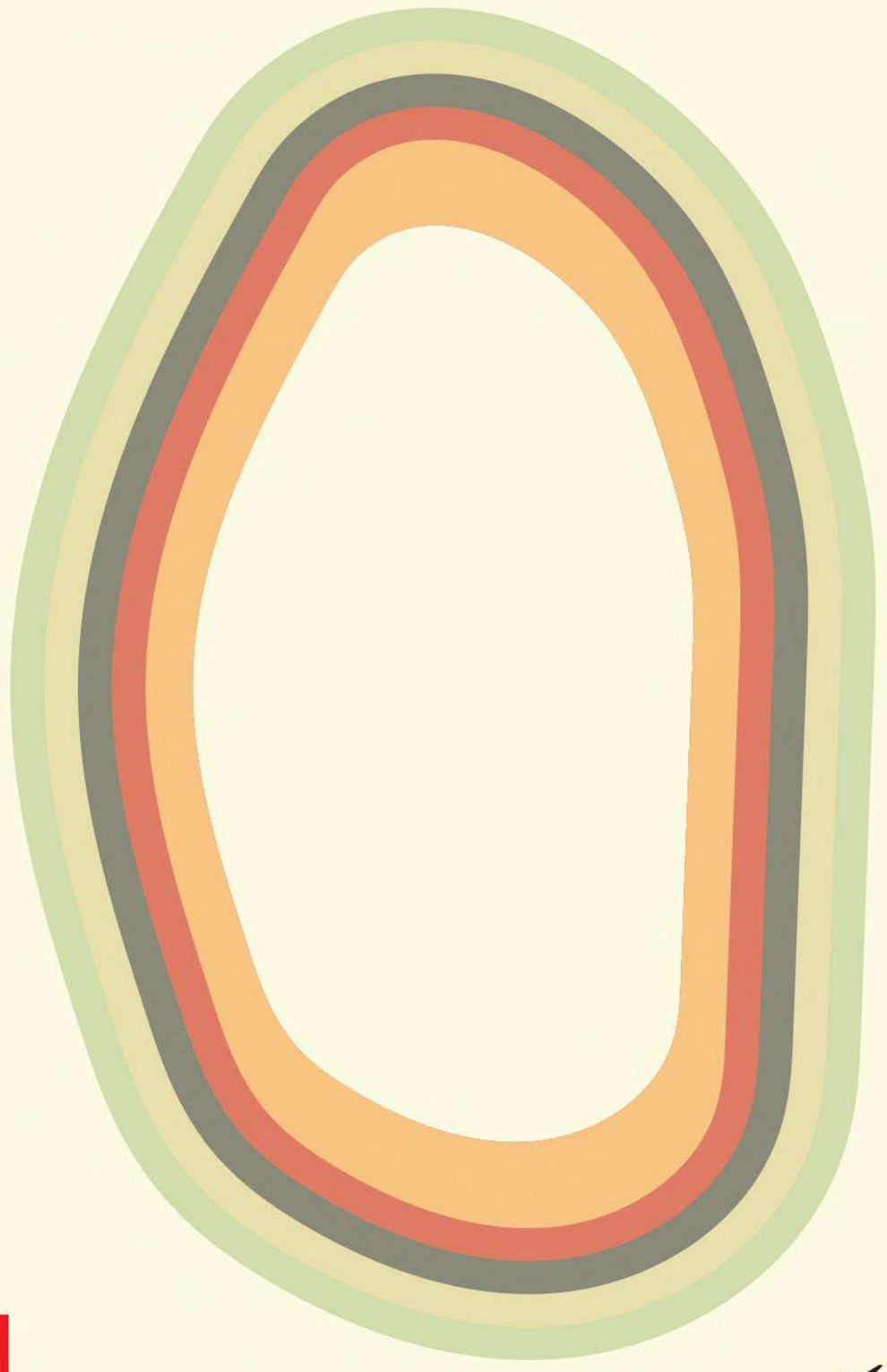

নব বাল্যশিক্ষা

ড. লোকানন্দ ভিক্ষু

ক দিয়ে কাকা হয় খ দিয়ে খানা,
গ দিয়ে গান হয় ঘ দিয়ে ঘানা।
ঙ দিয়ে হয় ব্যাঙ ডাকে রোজ গ্যাঁকো,
এ দিয়ে হয় একতা সকলে তা লেখো।
চ দিয়ে চাচা হয় ছ দিয়ে ছাতি,
জ দিয়ে জন্ম খুশির মতামাতি।
ঝ দিয়ে ওঠে ঝাঝ কি-যে তার ঝাল,
ঞ দিয়ে মিঞা ভাই বড় বেসামাল।
ট দিয়ে হয় টাকা সকলে তা চায়,
ঠ দিয়ে ঠাডা দেখে সকলে পালায়
ণ ছুটে যায় রণে খুব দেরী করে
ত দিয়ে থাকে তাক সব ঘরে ঘরে
থ দিয়ে থালা, থাকে খাবারের তলে
দ দিয়ে খাবো দৈ ছলে-কৌশলে
ন দিয়ে নানাবিধ শব্দের দল,
প তে পতাকা ফ দিয়ে ফল,
ব দিয়ে বন্ধু, ভ দিয়ে ভাই।
ম দিয়ে মামাকে সালাম জানাই,
র দিয়ে রাজা হয় শব্দের গুরু ।
ল দিয়ে লাশ বুক কাঁপে দুরুদুরু।
স দিয়ে হয় সভা বৈঠক ঘরে
শ একা একা রোজ হাঁটে এ-শহরে
হ দিয়ে হাসাহাসি আর কি-বা হয়,
মনে যেন থাকে সব পড়া নিশ্চয়।

ভাষার আকাশে ময়ূরপঙ্খী

অর্ঘ্য রায় চৌধুরী

দু'হাত পেতে দাঁড়াই
অক্ষরেরা তারার মতন ফুটে আছে

জন্ম জন্মান্তর ধরে ঘুমের ভেতর
তোমাকে "মা" বলে ডেকেছি
পাখিরা ডেকেছে, নদীরা ডেকেছে
এ দেশের প্রতিটা মানুষ ডেকেছে

বুকের ভেতর বিছিয়ে দিয়েছ শীতলপাটি
কবিতার নদীতে ভেসে উঠেছে ময়ূরপঙ্খী নাও
ভোরের নহবৎ

হে আমার মাতৃভাষা
চিঠিতে চিঠিতে লিখেছি প্রেম, রক্তপাতের ঠিকানা
অশ্রুর ধারাবিবরণী

সমাধি ফলক জুড়ে শব্দরা বিছিয়েছে মায়ার চাদর
দুঃস্বপ্ন জুড়ে বোবা ডাক

হে আমার মাতৃভাষা
আগুনে সেঁকেছি হাত তোমারই স্নেহের ওম ঘিরে

ডেকেছি প্রথম ডাক
মৃত্যুর অনন্ত পথে বিদায় জানিয়ে
চৌকাঠ পার হয়ে গেছি

হে আমার মাতৃভাষা
রক্তের স্রোতে তুমি বহমান নদী
প্রতিবাদী জিভের আগুন।

ভুলের মাশুল

ড. ধনঞ্জয় সাহা

না শুনে কথা ভুল করেছি
কেমনে এখন বাঁচি
হাত ধুইনি, মাস্ক পরিনি
হচ্ছে কাশি হাঁচি।

শরীর জুড়ে হাড়-জীবাণু
সেচ্যুরেশান কম
শ্বাস নিতে হয় কষ্ট বড়
আটকে আসে দম।

হাসপাতালে জায়গা তো নেই
ক্লিনিকগুলো বন্ধ
গরিব, ধনী মরছে সবাই
আইনের চোখ অন্ধ।

ভ্যাক্সিন নিয়ে রাজনীতি হয়
সার্টিফিকেট জাল
মরবে তারা, করোনাও...
ছেড়ো না ভাই হাল।

গল্প

লোহিত জমিন

কেয়া চ্যাটার্জী

রিক্সার প্যাডেলে ধীরে ধীরে চাপ দিচ্ছে রফিক। শরীর চলছে না আজ। পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে। মাথার ভেতরেও। শীর্ণ শরীরে সারাদিনে একমুঠো ভাত জোটেনি। তার ওপর আজকের ঘটনা যেন ঝড় বইয়ে দিল। এখনো চোখের সামনে দৃশ্যটা জ্বলজ্বল করছে রফিকের। উফ! এতগুলো তাজা প্রাণ নিমেষে শেষ। কালো পিচ রাস্তা ভেসে যাচ্ছে টাটকা, গরম, কালচে লাল রক্তে। গগনবিদারী বন্দুকের শব্দে থরে থরে সেজে উঠল মৃতদেহের সারি। সারা শরীর কাঁপছে রফিকের। কেন? কেন?

ছেলেটা ইউনিভার্সিটির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে গল্প করত বন্ধুদের সঙ্গে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, ঢোলা পাজামা, পাঞ্জাবি পরনে ছেলেটিকে বেশ মানাত। মুখশ্রী মায়া মাখা। রফিক রিকশায় বসে দেখতে পেত সব। ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা নানান বিষয়ে কথা বলত। সব কথা বুঝতে পারা রফিকের পক্ষে সম্ভব হত না সবসময়। তবে ক'দিন ধরে একটা বিষয় তাকে বড় ভাবাচ্ছিল। কারা যেন বলেছে বাংলা ভাষা আর বলা যাবে না।

রফিক অবাক হয়ে ভাবত, যে ভাষা সে জন্ম থেকে শুনে এসেছে, যে ভাষায় সে আজীবন কথা বলে এলো, যে ভাষায় সে স্বপ্ন দেখে, সুখের কথা-দুঃখের কথা প্রকাশ করে; সেই ভাষাটাই বেমালুম উবে যাবে? নিমেষেই নেই হয়ে যাবে? তাহলে কোন ভাষায় সে জল চাইবে, প্রার্থনা করবে, অভিমান করবে প্রিয় মানুষটির ওপর? তাহলে কি শেষ বয়সে এসে নতুন ভাষা শিখতে হবে? রফিক তার সহকর্মীদের জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তারাও সদুত্তর দিতে পারে না। একটা গোটা দেশের ভাষা পাল্টে যাবে! তাও কি সম্ভব?

রফিকের রিক্সায় চেপে অনেক ছেলে মেয়েই স্টেশন পর্যন্ত যায়। রফিকের ইচ্ছা হয় তাদের জিজ্ঞাসা করে অনেক কিছু। কিন্তু ভয় পায়। টহলদার দলের চোখ, কান সবসময় খোলা। সরকারের বিরুদ্ধে একটা শব্দ মানেই প্রাণ বিসর্জন। তবু মন থেকে মানতে বড় লাগে। দেশের ভেতর চলছে অনেক কিছুই। তার বেশিরভাগেরই খবর রাখে না রফিক বা তার মতো দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের দল। দুবেলা দু মুঠো ভাত, পরনের কাপড়, মাথার ওপর ছাদ—আর কী চাই? এটাই তো তাদের জীবন। একটা ঝড়ের শেষে রফিকরা ভিটে পেয়েছে। স্বজন হারানোর ঘা শুকোয়নি আজও। তবু সেসব ভুলেই চাষা রফিক আজ রিক্সা চালাচ্ছে। সবুজ ক্ষেত, সোনালি ফসলের দিন ছেড়ে কালো পিচ রাস্তাই তার খাদ্যের জোগানদার। তবু দিনের শেষে রাতের ঝাড়বাতির দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভেতর অতীতের ব্যথা চিনচিন করে ওঠে। ভবিষ্যতের চিন্তা তাকে ভাবায়। সে বুঝতে পারে আরেকটা ঝড় আসছে। আরও প্রাণের বলি হবে। আরও অনেক মায়ের কোল খালি হবে।

রফিক সেদিন রোজের মতোই দাঁড়িয়েছিল ইউনিভার্সিটির গেটের সামনে খদ্দেরের আশায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের পথে। রফিক সিটে বসে গামছা বাঁধা টিফিন বাক্সের ঢাকনা খুলে সবে দুটো মুড়ি মুখে দিয়েছে এমন সময় গেট থেকে বেরিয়ে এলো শয়ে শয়ে ছেলেমেয়ে। তাদের হাতে পতাকা, ব্যানার আরও কত লেখাজোখা। রফিক অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওদের দিকে। এতদিন একটা চাপা উত্তেজনার আবহ ছিল দেশময়। যেখানেই মিছিল-মিটিং হয়েছে পাকিস্তান সরকার অত্যাচার করেছে। কিসের মিটিং হচ্ছে? বুঝতে পারত না রফিক। বক্তৃতা শুনে

যেটুকু বুঝত তা তার সহজ সরল বুদ্ধিতে খুব বেশি অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারত না। শুধু এটুকু বুঝত, তার মতো ভাত বা কাপড়ের জন্য এরা লড়ছে না। লড়ছে না ছাদের জন্য। এই লড়াই এমন কিছুর যাকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। যার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ নেই। তবু আছে। যার অস্তিত্ব সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। এই লড়াইয়ের কোনো পারিশ্রমিক নেই। কোনো স্বীকৃতি নেই। নেই কোনো পুরস্কার। রফিক অবাক হয়ে ভাবে তরতাজা প্রাণগুলোর কথা। সেই ঝাঁকড়া চুলের ছেলেটির কথা, যাকে দেখলে তার নিজের ছেলেটির কথা মনে পড়ে যায়। কাঁটাতার পেরিয়ে আসার সময় যাকে হারিয়ে গেছিল। হয়তো পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে, অথবা হয়তো না খেতে পেয়েই মরে গেছে ছেলেটা। রফিকের ভেতর কে যেন থরথর করে কেঁপে ওঠে। সরকার সমস্ত মিছিল, সমাবেশ, পদযাত্রা বন্ধ রাখতে বলেছে। তারপরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা আজ বেরিয়েছে। তারা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে বেরিয়েছে। সামনে এগিয়ে যাচ্ছে সেই ঝাঁকড়া চুলের ছেলেটি।

ওদের কথা শুনে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে। ওদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটতে ইচ্ছে করে। রফিকের চোখে ভেসে ওঠে তার ফেলে আসা ভিটের ছবি। আচ্ছা, ভাষাও ঠিক মায়ের মতো, মাতৃভূমির মতো— তাই না? তাই তো, তার জন্য এত লড়াই, এত আত্মত্যাগ, এত ভালোবাসা মানুষগুলোর। রফিকের সারা শরীর আবার কেঁপে উঠল। সামনেই দাঁড়িয়ে পুলিশ বাহিনী। তরুণ-তরুণীরা নির্ভীক। তাদের দৃপ্ত পদধ্বনি হুঙ্কার তোলে। তাদের কণ্ঠের দৃঢ়তা, ফুলে ওঠা শিরা, কপালের ভাঁজে তাদের অঙ্গীকার সুস্পষ্ট । রফিকের মনে আশ্বাস জাগে। ভিটেবিহীন হয়েও নতুন দেশে, নতুন ভাষার যন্ত্রণা বহন করতে হবে না। শেষ সম্বলটুকু আগলে রাখতে দেবে ওরা। ঐ কাঁচা মাথাগুলো।

এক, দুই, তিন— তারপর অজস্র। অজস্র গুলির বর্ষণ। সেই শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। রফিকের হাত থেকে পড়ে গেল খাবারের বাক্স। পা দুটো শিথিল হয়ে পড়ল। শব্দের শেষে একরাশ নিস্তব্ধতা। মৃত্যুর, পৈশাচিক উল্লাসের নির্মম নিস্তব্ধতা। ঝাঁকড়া চুলের ছেলেটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে। তার শরীর ঝাঁঝরা করে দিয়েছে সহস্র গুলি। তার আশেপাশে বিছিয়ে রয়েছে মৃতদেহের সংঘবদ্ধ সারি। কয়েক মুহূর্ত আগেই যাদের জয়ধ্বনিতে বিদারিত হচ্ছিল অম্বর। তারাই পরমুহূর্তে পাষাণসম নিশ্চল। মুহূর্তে ফাঁকা করে দেওয়া হলো এলাকা। রফিকের মতো আরও কয়েকজনকে সরিয়ে দেওয়া হলো নিমেষে। রফিক রিক্সার প্যাডেলে চাপ দিল। তার শরীর চলছে না। তার মস্তিষ্ক নির্বাক। বাড়ি ফিরে রিক্সাটা গাছ তলায় রেখে সে ধীরে ধীরে দাওয়ায় এসে বসে। মাথা টলছে। মাটির কলসি থেকে ঠান্ডা জল ঢেলে দেয় মাথায়, গায়ে। আহ, শান্তি! মাটি, মাটির ছোঁয়া। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। একটি দিনের সমাপ্তি ঘোষণা করছে তার আবির ছড়ানো আলো। শেষ মানেই কি শেষ? না, তা তো নয়। শেষের মানেই শুরু। আরেকটি লড়াই, আরেকটি পথের। এতগুলো টাটকা প্রাণের বিনিময়ে কি আসবে না ভাষার স্বাধীনতা? স্বাধীনতা আসলে আসে না, ছিনিয়ে নিতে হয়। রফিক ঘুমন্ত সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে। কেউ দেখতে পায় না তার চোখে আসলে ফুটে উঠেছে সূর্যোদয়ের গান।

ভাষা শহীদদের
প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

DR. INAMUL SABOOR

Medical Doctor at
Saboor Waizun Medical

সজল শাহাবুদ্দিন, বয়স ছেচল্লিশ, সুদর্শন এবং একজন সুশিক্ষিত তরুণ। হন্তদন্ত হয়ে অফিসে এলেন। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই অফিসের কাজের পাশাপাশি আরও একটি অতিরিক্ত দায়িত্বে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভাষা ও নৃতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালন করে চলেছেন গত পাঁচ বছর হলো।

রুকাইয়া হাসিন, তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী তড়িঘড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আইপ্যাডে অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউল তৈরি করে রাখা তার নৈমিত্তিক কাজ। সজল সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, "আজকের দিনটা খুব প্যাকড, কিছু বদলাতে হবে কি না বলবেন স্যার, তাহলে সকাল সকাল রিশিডিউল করে দিতে পারব।"

সজল সাহেব স্মিত হেসে বললেন, "সুপ্রভাত, রুকাইয়া। জি, একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবশ্যই জানিয়ে দিচ্ছি। আর সব খবর ভালো তো?"
রুকাইয়া হাসিন, তাঁর বিশ্ববিখ্যাত টোলপড়া হাসি হেসে বললেন , "ভালো আছি স্যার। সবাই ভালো"
মোটামুটি এভাবেই দিন শুরু হয় সজল শাহাবুদ্দিনের। স্ত্রী এবং সতেরো বছরের কন্যাকে নিয়ে ঢাকা শহরে তাঁর সুখী জীবন কেটে যাচ্ছে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত সজল সাহেবের আরও একটি পরিচয় আছে। ভাষাসৈনিক ফজল শাহাবুদ্দিনের একমাত্র পুত্র তিনি। ২০১২তে তিনি পোস্টুমাস একুশে পদক লাভ করেন। সজল সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক শেষ করেন এবং ইংরেজি সাহিত্যে পোস্ট ডক্টরেট করেন Barkley থেকে। সেখানেই ক্যাথির সঙ্গে পরিচয়। জড়িয়ে পড়েন প্রণয় এবং পরিণয়ে। তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন ক্যাথি পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই অনুসন্ধিৎসু বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে। বিবাহ পূরবর্তী তাদের সময়ের অধিকাংশ সময়ই কেটে যেত এই সব আলোচনার মধ্যে দিয়ে। ক্যাথির ইচ্ছেতেই পোস্ট ডক শেষে দেশে ফিরে আসেন সস্ত্রীক। আজকাল ক্যাথির বাংলা শুনে কেউ বলতে পারবে না সে বাঙালি নয়। শুধু ভাষা নয়, সংস্কৃতিকেও আয়ত্ত করেছে নিপুণ পারদর্শিতায়। রবিঠাকুরের গীতাঞ্জলি তাঁর বাইবেল সম। ওহো, ভুলে যাবার আগেই বলে রাখি, ওর পরিচিত মহলের সকলেই ওকে 'কেতকী' বলে ডাকে। হ্যাঁ, শেষের কবিতার 'কেতকী' ওর খুব প্রিয় চরিত্র।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন সজল সাহেব। দুটো সেমিনার, একটা টেলিভিশন সাক্ষাৎকার। সবগুলোই দুপুর দু'টোর পর। সামলানো যাবে বলেই মনে হচ্ছে। টেলিভিশন সাক্ষাৎকারটার রেকর্ডিং বিকেলে। "একুশে একাত্তরে" জনপ্রিয় একটি চ্যানেল, সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু, বাবা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়ে আলোকপাত। হঠাৎ, মনে পড়ে গেল, রাইসুল চাচার কথা। দু'বছর আগে রাইসুল চাচা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। অভীক, রাইসুল চাচার ছেলে, সজলের থেকে বয়সে তিন-চার বছরের ছোট হবে। বর্তমানে বস্টনে স্থায়ী বসবাস করছে। রাইসুল চাচার শেষকৃত্যের সময় দেশে এসেছিল সে। চাচার ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে একটি ডায়রি তাঁকে দিয়েছিল। বলেছিল,

"আমি আর কী করব, সজল'দা? ফজল চাচা বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, কয়েক পাতা পড়েছিলাম। তাঁদের ছাত্র জীবনের কথা চোখে পড়েছে। সময় সংকট আর নানারকম ব্যস্ততায় আর পড়া হয়ে ওঠেনি। আমার কাছে হয়তবা অপঠিতই রয়ে যাবে। তোমার কাছে থাকুক বরং। তোমার কখনো কাজে আসতে পারে।"

সজল এক মুহূর্ত কিছু একটা ভেবে নিলেন। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। এতক্ষণে "একুশে একাত্তরে"র দপ্তরে জাহিদের চলে আসার কথা। জাহিদের সঙ্গে এর আগেও সজলের বেশ কিছু ইন্টারভিউ হয়েছে। সেল ফোনের কন্ট্যাক্ট থেকে ডায়াল করলেন।

"হ্যালো সজল ভাই বলেন, ভালো আছেন?" ফোনের ওপাশ থেকে জাহিদের কণ্ঠ ভেসে এলো,
-"ভালো আছি জাহিদ। তুমি?"
"জি, ভালো। সময়টা ঠিক আছে সজল ভাই? সম্ভব হবে আজকে? খুব ক্যাজুয়াল ইন্টারভিউ। তেমন কিছু প্রস্তুতিও লাগবে না।"

"আসলে জাহিদ, ভাবছিলাম, বাবাকে নিয়ে যখন হচ্ছে তখন একটু অন্যরকম করলে কেমন হয়? আমার কাছে থেকে তো সবসময়ই শোনা হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে। বাবার বন্ধু রাইসুল চাচার একটি ডায়েরি আছে। ভাবছিলাম, ওখান থেকে যদি ক'টা স্মৃতিকথা পাঠ করা যায়, তাহলে কেমন হবে?"

"তাহলেও খুব ভালো হবে সজল ভাই। রিশিডিউল করলে দু'দিন পর এই একই সময় করতে পারব। আপনার পক্ষে সম্ভব?"
"একদম। তাহলে এই কথাই রইল। আমি আজ কালের মধ্যেই ডায়েরি পড়ে জানাব তোমাকে যদি কোনো মেটেরিয়াল পাই। রাখছি এখন। কথা হবে একবারে দু'দিন পর।:
বেশ ভালোই হলো। এর মধ্যে বাবাকে আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে জানা হবে। বাবা এবং রাইসুল চাচার মধ্যে আজব একটা বন্ধুত্ব ছিল। কথায় কথায় দু'জনের তর্ক শুরু হয়ে যেত। সেই সব তর্কের বিষয় অবশ্য সজলের জানার কথা না। রাইসুল চাচা খুব কম আসতেন তাঁদের বাড়িতে। অন্তত সজল যখন দেশে ছিল তখন মনে আছে বাবা এবং রাইসুল চাচা যতটা না পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া আসা করতেন, মা এবং কংকনা চাচির মধ্যে যোগাযোগ ছিল অনেক বেশি। একসঙ্গে মহিলা সমিতি মঞ্চে নাটক, শিল্পকলা একাডেমির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে নিয়ম করে এরা দুজন যেতেন। একুশে ফেব্রুয়ারির কাকডাকা ভোরে, চিকন কালো পাড় সাদা শাড়িতে নিরাভরণ মা, কংকনা চাচি, আর বাবার সঙ্গে খালি পায়ে সজলের শহিদ মিনারে যাবার কথা মনে পড়ে গেল। আজকাল, একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন না স্মরণ যাপন তা নিয়ে খুব সন্দিহান হয়ে পড়েন সজল। ক্যামেরা এবং ফ্ল্যাশের আলোয় শহিদ বেদিকে নাটকের মঞ্চ মনে হয় এখন। রকমারি বেশভুষা, প্রচার মাধ্যমের উচ্চকিত আওয়াজে, "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি" চাপা পড়ে যায়। মিডিয়া এবং সংবাদের ভিড়ে অবহেলিত হয় ভাষা শহিদের রক্ত।

আজ সকালে বোধ হয় একটু অতিরিক্ত ভাবমেদুর হয়ে পড়েছেন সজল। রেট্রোস্পেক্টিভ পরিক্রমায় সজলের সাদা কালো রিলে ধরা পড়েছে আরও একটা স্মৃতি। তাঁদের প্রভাতফেরির সঙ্গী হিসেবে কখনই রাইসুল চাচাকে পাওয়া যায়নি। কংকনা চাচির কাছ থেকে শুনেছে, বহু অনুরোধ উপরোধ সত্বেও তাঁকে রাজি করানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু, কেন? এর উত্তর নিশ্চয়ই তার ব্যক্তিগত লেখায় পাওয়া যাবে এবং তার জন্য ওই ডায়েরিই একমাত্র আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখাতে পারে।
নতুন একটা প্রজেক্টে হাত দিয়েছেন সজল শাহাবুদ্দিন। সেটা হলো বাংলা ভাষাতে যেসব স্ল্যাং বা বিকৃত বাংলা শব্দ ঢুকে যাচ্ছে তাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নাটক, শিল্প এবং সাহিত্যে ভুলভাল সংলাপ, বাক্য প্রায় ভাষাদূষণের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে । বিতর্ক উঠেছে, ভাষা বহমান বলে পরিবর্তন ঠেকানো যাবে না । একদম সত্যি কথা, এই যুক্তিতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু, মিশ্রণ হওয়া প্রয়োজন বুদ্ধিমত্তার– স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই হতে পারে না। "আমরা বাঙালি, বাঙ্গাল ভাষাই আমাদের ভাষা। আমরা কলকাতার ভাষায় কথা বলব কেন? –এই খেলো যুক্তিতে সজল শাহাবুদ্দিন প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে, "আমরা বাঙালি, বাংলা ভাষায় কথা বলি" –এটাই হওয়া উচিত প্রত্যেক বাঙ্গালির লক্ষ্য। ভাষার মধ্যে কাটাতারের বেড়া যারা ঠুকে দিতে চায়, তিনি তাদের বিরুদ্ধে।
অফিসের কাজকাম শেষ করে, রুকাইয়াকে ইন্টারকমে জানালেন ওকে বাড়ি চলে যেতে। আগামিকাল ছুটির দিন। অনেকেই কিছুটা আগেই বাড়ি চলে গেছে। তিনিও জরুরি কাগজপত্র, ল্যাপটপ গুছিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেলেন। গাড়িবারান্দায় গাড়ি রেখে বসার ঘরে ঢুকেই মন ভালো হয়ে গেল। প্রতিবারের মতো এবারেও একুশের রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে। কেতকীর প্রিয় কম্পোজিশন,
"জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।
যতবার ও এই গানের এই বিশেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে কণ্ঠ মেলায়, অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে ওর সবুজ চোখদুটো। দেশের জন্য জীবন বাজি রাখা ও বুঝতে পারে কিছুটা, কিন্তু ভাষার জন্য বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়া...
"এটা শুধু বাঙালিরাই পারে, সজল।" প্রতিবারই এটা ও পরম নির্ভরতার সঙ্গে উচ্চারণ করে।
রিহার্সাল শেষে জলখাবার এবং তারপর একে একে সবাই বিদেয় নিলে রাতের খাবারের পাট চুকিয়ে নেয় ওরা তিনজন। কন্যা অংকিতার সঙ্গে কিছু সময় খুনশুটি শেষে স্টাডিতে এসে ডায়েরিটা হাতে নেয়। খুব সাধারণ একটি ডায়েরি, কালো চামড়ায় মোড়ানো। কখনো নীল কালি, কখনো কালো কালি দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। অনিয়মিত এন্ট্রি। মাঝখানে কয়েকটা পাতায় লাল কালিতে লেখা কিছু কথা সজলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

প্রায় কোনোরকম বিরতি ছাড়াই পুরো ডায়েরিটাই শেষ করলেন তিনি। স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন সজল। এই মুহূর্তে তিনি ঠিক কীভাবে তাঁর হতাশা এবং ক্রোধ জানাবেন, কাকেই বা জানাবেন তিনি জানেন না। সজলের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। রাইসুল চাচা কেন বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কী নিয়ে তাঁদের মধ্যে বচসা হতো, কেন তিনি তাঁদের সঙ্গে প্রভাতফেরিতে যেতে চাইতেন না –সব এখন স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। এতটাই স্বচ্ছ নিজেকে প্রায় নগ্ন মনে হচ্ছে। বাবা এতদিন সবাইকেই প্রতারণা করে এসেছেন। তিনি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে কখনই জড়িত ছিলেন না। ঢাকা মেডিকেলের সমুখে যেদিন প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ হচ্ছিল, তিনি রাইসুল চাচার রুমে সারারাত বসেছিলেন তার কামরায়। ভোরের দিকে তিনি নিজেই নিজেকে আহত করেন আত্মঘাতী বুলেটে। ঢাকা মেডিকেলের গেট থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হয়। ডান পা থেকে গুলিটা বের করতে পেরেছিল সার্জারি করে। কিন্তু এর ফলে তাকে পা টেনে টেনে হাঁটতে হয়েছে। তিনি জানতেন, ক্ষণিকের এই আঘাত পরবর্তী সময়ে তাকে অলংকৃত করে তুলতে পারে। সরকারি সুবিধা প্রাপ্তিতে এটাই হবে তার ট্রাম কার্ড। সমস্ত জীবন তিনি এটারই চরম ফায়দা তুলেছেন। ব্যবসায় পারমিট, বড় অঙ্কের কন্ট্রাক্ট, ইত্যাদি এই মিথ্যে সম্মানের খাতিরেই।

"আসসালাতু খাইরুম মিনান্নাউম"... বাড়ির পাশের মসজিদ থেকে ভেসে আসছে আযানের আওয়াজ।
বড় পবিত্র এই সময়। সকল তঞ্চকতা থেকে মুক্ত হবার জন্য তৈরি হয়ে নিলেন। আপাতত ভোরের আলো ফোটার অপেক্ষা করবেন সজল শাহাবুদ্দিন। জাহিদকে ফোন করে "একুশে একাত্তরে"র সাক্ষাৎকারে একান্ত পাঠে ডায়েরির কথা কনফার্ম করবেন। ধীর পায়ে হেঁটে বুকশেলফ থেকে নামিয়ে নিলেন, একুশের পদক। একুশে পদকের সঙ্গে জড়িত দায়িত্বে যারা আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফিরিয়ে দেবেন এই পদক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তিনি এর যোগ্য উত্তরসূরি নন।
মন বিক্ষিপ্ত হলেও তিনি জানেন, নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে এতটুকু তাঁকে করতেই হবে।

গল্পের গল্প

মিতা হোসেন

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল সোহাগ। এই সকাল বেলাতেই সুপ্তির সঙ্গে বাক-বিতন্ডা! সুপ্তি অবাক হয়ে ভাবে সোহাগ কেন এমন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন! স্বল্পবাক, বিনয়ী, ভদ্র একজন মানুষ সোহাগ, যাকে সুপ্তি ভালবেসে বিয়ে করেছিল, সে কোথায় হারালো? এ কোন সোহাগ? দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুকের ভেতর থেকে! আসলে..... সুপ্তি ভাবে, নতুন এই দেশে আসবার পর থেকেই সোহাগ যেন আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। কিছুটা বুঝতেও পারে সুপ্তি; নতুন দেশে, নতুন করে নতুন সবকিছুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে যেয়ে ওরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে! সোহাগের কাজটা এখনো স্থায়ী হয়নি, একটা অনিশ্চয়তা কাজ করছে ওর ভেতর। সুপ্তিও কাজ করছে একটা ফাস্ট ফুডের রেস্টুরেন্টে। গল্প যাচ্ছে স্কুলে। দেশে যেমন অবস্থানে ছিল ওরা, এই মার্কিন মুল্লুকে এসে ওদের কিছুটা যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। অনেকবার ভেবেছে ফিরে যাবে দেশে। কিন্তু সোহাগের ভাই-বোনেরা যেতে দিতে চাইছেন না। সবাই এখানে, সোহাগ একা দেশে কি করবে! ওদের বুঝিয়েছেন, প্রথম কয়েকটা বছর একটু কষ্ট হবে, তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এর মধ্যেই সুপ্তি কনসিভ করেছে। এ সবকিছু মিলিয়ে সোহাগ একটু নাজুক অবস্থায় আছে। সুপ্তিও সেটা বুঝতে পারে।

ঐদিন সুপ্তির শ্রীলঙ্কার বান্ধবী দিঘাও বলছিল, 'সুপ্তি, এটা খুবই স্বাভাবিক, সোহাগের উপর তোমাদের সবার দায়িত্ব, ও ভাবছে কি করে সামলাবে। ওর চাকরিটা স্থায়ী হয়ে গেলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে, কোনো চিন্তা করো না।' সুপ্তি ওর সুখ-দুঃখের কথা দীঘার সঙ্গে অনেক সময় শেয়ার করে, মনটা হাল্কা হয় কিছুটা। আর দীঘাও ওকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে সান্ত্বনার কথা বলে।

আজকের ঝগড়ার বিষয় গল্প। গল্পকে সুপ্তি বাংলা পড়াচ্ছে, এখানেই সোহাগের আপত্তি। গল্পকে কেন বাংলা পড়াচ্ছে সুপ্তি; গল্পের উপর চাপ পড়ছে; প্রায়ই স্কুল থেকে নালিশ আসে, গল্প নাকি ইংরেজি ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। এখন বাংলা পড়াতে গেলে ইংরেজিতো সে শিখতেই পারবে না। আজ সকালে সোহাগ বলছিল গল্পের সঙ্গে বাসায় ইংরেজিতে কথা বলতে, তাহলে গল্পের জন্য ইংরেজিটা সহজ হয়ে উঠবে। কিন্তু সুপ্তি সেটা নাকচ করে দিয়েছে। সেটা নিয়েই এই ঝগড়ার সূত্রপাত। সুপ্তির মতে বাসায় গল্পের সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলতে হবে। ইংরেজি শেখাটা এই দেশে কোন ব্যাপারই নয়; গল্প স্কুলে ইংরেজি শিখছে ইএসএল ক্লাসে। বন্ধুদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলছে, টেলিভিশনে ইংরেজি দেখছে কাজেই ইংরেজি শেখাটা ওর জন্য কোনো সমস্যাই হবে না। সমস্যা হবে বাংলা ভাষাকে ধরে রাখা। গল্প তো মাত্র কিন্ডারগার্টেনে পড়ে, ফার্স্ট গ্রেডে যেতে যেতেই গল্প ইংরেজি রপ্ত করে ফেলতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু সোহাগ তা বুঝতে নারাজ। ওর ধারণা এতে গল্পের ক্ষতি হচ্ছে, গল্প স্কুলে পিছিয়ে পড়বে। রাগ করে নাশতা শেষ না করেই বেরিয়ে গেল।

গল্পের বাংলা শেখার ব্যাপারে সুপ্তির এত আগ্রহ কিন্তু গল্পের কারণেই। গত ফেব্রুয়ারি মাসে গল্পের স্কুল থেকে ডাক এলো যে গল্প নাকি ইংলিশ বাদ দিয়ে বাংলায় কথা বলছে। সুপ্তি স্কুলের ফোন পেয়ে সাত তাড়াতাড়ি স্কুলে যেয়ে যখন গল্পের কাছে শুনল কেন গল্প ঐদিন বাংলায় কথা বলছিল, তখন থেকেই সুপ্তি মনে মনে স্থির করে রেখেছিল গল্প যেন বাংলা ভাষা ভুলে না যায় সেই জন্য বাসায় সে গল্পের বাংলাচর্চাটা ধরে রাখবে। গল্প সেইদিন সুপ্তিকে বলেছিল আজকে ২১ ফেব্রুয়ারি, গল্প এই দিনটায় কিছুতেই ইংলিশ কথা বলবে না, শুধু বাংলাই বলবে। গর্বে সুপ্তির বুক ভরে উঠেছিল। গল্পের টিচারও যখন গল্পের বাংলা বলবার কারণটি সুপ্তির কাছে জানতে পেলেন, তিনিও অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই গল্পের বাংলা ভাষাটাকে ধরে রাখার জন্য সুপ্তিকে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে। আশার কথা হলো, গল্পও খুব আগ্রহ নিয়েই বাংলা পড়ছে মায়ের কাছে। কত যে তার প্রশ্ন। সুপ্তির খুব ভাল লাগে! কিন্তু সোহাগের এই আচরণ সুপ্তিকে বিব্রত করে বৈকি।

গল্প এখন নিজেই বানান করে বাংলা পড়তে পারে। দেশের স্কুলে যা যা শিখে এসেছিল, তার সঙ্গে মায়ের কাছে নিয়ম করে পড়তে পড়তে বাংলাটা ভালই রপ্ত করছে। যখন বন্ধুরা বলে বাহ তোমাদের ছেলে তো কি সুন্দর শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা বলে, তখন গর্বে সুপ্তির বুক ভরে যায়। সোহাগ অবশ্য তখন তাদের বলে যে এর পুরো কৃতিত্ব সুপ্তির। সুপ্তি আশা করছে সোহাগ বুঝতে পারবে। তবে সোহাগের দুশ্চিন্তাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গল্পের ওপর যদি সত্যিই চাপ পড়ে যায়? গল্প যদি বিভ্রান্ত হয়ে যায়? সুপ্তি ভাবে গল্প এখনো অনেক ছোট, কিন্ডারগার্টেনে পড়ার চাপ তেমন নয়, এখনই সময়। পরে উঁচু ক্লাসে গেলে গল্পের এমনিতেও আর সময় হবে না। নাহ, সুপ্তি হাল ছাড়বে না। তবে সোহাগের সঙ্গে এ নিয়ে আর কথাও বাড়াবে না, মনে মনে এটাও ঠিক করে রাখল সে। সোহাগের দিকটাও সে বুঝতে চেষ্টা করে। একদিন নতুন দিন আসবেই, এই বিশ্বাস ওর। তাছাড়া এখন ওর নিজেরও সাবধানে থাকা দরকার। মানসিক চাপ নেয়ার মতো অবস্থা ওর নেই। গল্পের একটা ভাই অথবা বোন আসছে, তার কথা চিন্তা করেই সুপ্তিকে চুপ করে থাকতে হবে এবং সোহাগকেও

বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে হবে। সোহাগ যেমন খিটখিটে মেজাজের হয়ে গেছে, কী করে বুঝাবে সেটা ভাবছে সুপ্তি।

কদিন থেকে গল্প আর সুপ্তি বেশ ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। সোহাগ ব্যাপারটা খেয়াল করেছে, কিন্তু ধরতে পারছে না। যাকগে, সুপ্তিকে সে এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। সুপ্তি থাকুক ওর জগৎ নিয়ে। গল্পের যদি কোনোরকম কোনো সমস্যা হয়, তো সুপ্তিকে সে ছাড় দেবে না, কিছুতেই না। ঐদিনের ঝগড়ার পর থেকে কথা বন্ধ ছিল কদিন। কিন্তু গত উইকএন্ডে দীঘা আর ওর স্বামী এসেছিল বেড়াতে; গল্পে গল্পে দীঘা জানিয়েছিল ওর স্বামী স্যাম কেমন করে ওর যত্ন নিত যখন সে সন্তানসম্ভবা হলো। কারণ কাছের মানুষ বলতে দীঘার শুধু স্যামই ছিল। তাই দীঘার যেন কোনো সমস্যা না হয়, সেদিকে স্যাম এর তীক্ষ্ণ খেয়াল ছিল। ওদের কথা শুনে সোহাগের রাগ পড়ে গিয়েছিল সুপ্তির ওপর। সত্যিই তো? এদেশে সুপ্তির তো সে ছাড়া আর কেউ নেই। সুপ্তির বাবা-মা ভাই-বোনেরা সবাই দেশে। সুপ্তিও তো নতুন দেশে, নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াচ্ছে, সেই সঙ্গে গল্পের স্কুলের ব্যাপারটি একাই সামলাচ্ছে, কারণ সোহাগ সারাদিনের জন্য চলে যায় অন্য একটি শহরে। তার উপর সুপ্তি কাজও করছে এই শরীর নিয়ে। সংসার সামলাচ্ছে। সোহাগের পরিবারের সবার খোঁজ খবর রাখছে। খুব অনুশোচনা ভর করলো সোহাগের মনে। কিন্তু নিজের ইগোর কারণে সুপ্তিকে সেটা বুঝতে দিল না।

আজ সোহাগের জন্মদিন। সুপ্তি আগেই ঠিক করে রেখেছে কী কী রান্না করবে। ছুটিও নিয়ে রেখেছে। সোহাগ বের হয়ে যাবার পর সুপ্তিও গল্পকে স্কুল বাসে উঠিয়ে দিয়ে এল। ওরা চলে গেলে, আর যদি সুপ্তিরও ছুটি থাকে তো গল্প স্কুল থেকে ফেরা পর্যন্ত এই সময়টা সুপ্তির একান্ত নিজস্ব! কখনো দেশে কথা বলে। কখনো ওর প্রিয় একটি কাজ লেখালেখি, সেটা করে। আরও প্রিয় একটি কাজ হলো গান করা, তাও করে। এদেশে আসবার পরে, কষ্ট করার এই সময়টাতে সুপ্তির প্রিয় কাজগুলোর চর্চা সেভাবে আর হচ্ছেই না। তবে এখন ওর প্রিয় কাজ বলতে গল্পের সঙ্গে সময় কাটানো। গল্পের সঙ্গে খেলা। ওকে পড়ানো, বিশেষ করে বাংলা। গল্পও খুব উপভোগ করে মায়ের সঙ্গে সময় কাটানো। গল্প প্রায়ই বলে, 'মা তোমার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতে আমার বেশি ভালো লাগে, কারণ আমরা অনেক গল্প করতে পারি।' মাঝে মাঝেই স্কুল বাস মিস হয়ে যায়, তখন সুপ্তি ওকে স্কুলে নিয়ে যায়। আর যাবার পথে কত যে গল্প করে দুজনে। সুপ্তিও খুব উপভোগ করে গল্পের সঙ্গে গল্প করা। রান্নাঘরে কাজ করতে করতে নিজের মনেই হাসলো সুপ্তি। তখনি ফোনটা এলো। সোহাগের ফোন।

'হ্যালো'
'সরি'
'কি হলো'
'আই অ্যাম এক্সট্রেমলি সরি'
'সরি কেন'
'তুমি জান কেন'
'না আমি জানি না, বলো তুমি'
'আমার ভুল ছিল'
'কী ভুল ছিল?'
'আমি সত্যিই অনুতপ্ত'
'বেশ ভালো, কিন্তু কেন?'
'সুপ্তি, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ'
'কেন?' সুপ্তি চাইছে সোহাগ নিজেই বলুক সে কেন দুঃখিত!

ওপাশ থেকে সোহাগের কণ্ঠ ভেসে এলো...ধরা গলায় সোহাগ একটি চিঠি পড়ছে!

'আমার প্রিয় বাবাই, শুভ জন্মদিন। তোমাকে আমি অনেক ভালোবাসি। অনেক অনেক অনেক, তা কি তুমি জান? তুমি আর মা হলে আমার পৃথিবী। বাবা, তুমি কি খুশি হও না যখন আমি বাংলায় কথা বলি? আমি জানি তুমি অনেক খুশি হও। আর এখন তুমি আরও বেশি খুশি হয়েছো আমার এই চিঠিটি পেয়ে, হয়েছো না? আমি জানি তোমার চোখে পানি চলে এসেছে খুশিতে, তাইনা বাবা?
মার সঙ্গে আর রাগ করোনা কিন্তু। আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না বাংলা শিখতে। আজকে তোমার জন্মদিনে আমরা অনেক মজা করব, আচ্ছা বাবাই?
(চিঠিটা কিন্তু আমি নিজে নিজে লিখেছি। মা'র কাছে অল্প একটু সাহায্য নিয়েছি)
ইতি
তোমার গল্প

'সুপ্তি, এই চিঠিটির জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ! আমাকে মাফ করে দিও।'
সুপ্তি নিশ্চুপ! এই চিঠিটি যাতে সময়মতো সোহাগের কাছে পৌঁছে সেজন্য কত কী করল এ কদিন ধরে। চোখের সামনে সুপ্তির সেগুলোই ভাসছে। সোহাগের অফিসের সেক্রেটারির সাহায্য নিতে হয়েছে ওর। সোহাগকে সেলফোনে না পেলে কখনো কখনো জরুরি প্রয়োজনে অফিসের সরাসরি নাম্বারে ফোন করতে হয় সুপ্তিকে, তখনই শ্যারন নামের এই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয়। শ্যারনকে বুঝিয়ে বলতেই ও রাজি হয়ে গেছিল।

'কোনো চিন্তা করো না তুমি। অফিসের সব চিঠিতো আমার কাছেই আসে, তারপর আমিই সবার ইনবক্সে রেখে আসি চিঠিগুলো। আই ইউল টেক কেয়ার অফ ইট উইথ প্লেজার।'
গল্পের এই চিঠিটি সোহাগকে ঠিক জন্মদিনের দিনই পৌঁছে দিতেই শ্যারনের সাহায্য নিতে হয়েছে। গল্পের এই শুভেচ্ছা বার্তা সোহাগের অফিসের ঠিকানায় পোস্ট করেছে। দুদিন আগেই ওটা জায়গামতো পৌঁছেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্যারন আজই ওটা সোহাগের ইনবক্সে রেখে এসেছে; আর সোহাগ কাজে গিয়ে অবাক তার ছেলের চিঠি পেয়ে, সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্তিকে ফোন।
সোহাগ বলে চলেছে, 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জন্মদিনের উপহারটা আজকে আমি পেয়েছি। এমন একটি চিঠি আমি পাব, তাও নিজের আত্মজের কাছে থেকে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সুপ্তি, অনেক ভালোবাসি তোমাকে। অনেক ভালোবাসি আমার সন্তানদের মাকে। আমার গল্প, আমার অনাগত সন্তান, আমার তুমি, তোমরাই আমার পৃথিবী...আজ আর কাজ করছি না। এক্ষুণি বের হয়ে যাচ্ছি, গল্পকে স্কুল থেকে তুলে নিয়ে সোজা বাসায়...।'

সোহাগের চোখে জল। সুপ্তির চোখেও।

জীবনের ঘাটে বাঁধা দ্বিধার নৌকো

রাজিয়া নাজমী

মেঘেঢাকা সকালটা আজ অন্যরকম সকাল হবার কথা ছিল।

কথা ছিল- সকাল থেকে সারাবেলা অনেক দূর থেকে আসা একজনের হাতে হাত রেখে হেঁটে হেঁটে চেনা অচেনাদের ভিড় কেটে সেন্ট্রাল-পার্ক লেকের পাশে শীতের সবুজ ঘাসের গালিচায় বসে কোটি কথার মাঝে যে কথাটি এখনো বাকি তার কাছে নতজানু হবে।

রাই ঘাস বাঁচিয়ে লেকের পাশে পাথরে বসল। পার্কের সবকিছু তেমনই আছে- রাস্তা, বেঞ্চ, লেকের রং, ব্রিজ। ভাঙেনি কিছুই। তাহলে কী ভেঙে গেছে?

পার্কের লেকে একজোড়া হাঁস রাইয়ের খুব কাছে এসে প্যাঁকপ্যাঁক করে যেন জানতে চায়- ও একা কেন! বলেই আবার ওরা ঘুরে চলে যায়! রাই বোঝে না- ওরা দুঃখ পেল, না রাইকে করুণা করল!

জোড়াহাঁস আবার ফিরে আসে।

রাই বলে, কিরে শুনবি- কী লিখেছে কাল রাতে? পরিস্থিতি মেনে নিতে লিখেছে। কী-রে বুঝলি না তো! আমিও বুঝিনি- কেবল স্বপ্ন দেখার নেশা পেয়ে বসেছিল তার। তাই সত্য-মিথ্যার খেলায় মেতে- সাহসী হয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল।

হাঁস প্যাঁকপ্যাঁক করে বলে, যার বুকে সাহস নেই তাঁর ইচ্ছে হয় বলতে নেই-নেই।

আরে চলে যাস না, শোন আরও ইচ্ছের কথা- ঘর বাঁধার বাসনা! বলেছে, আমার অঙ্গে জড়াতে ইচ্ছে করে ভালোবাসার নকশিকাঁথা, বেণীতে চন্দ্রমল্লিকার সুবাস, দুহাতে মেহেদির রঙে রাধা-কৃষ্ণ নাম!

একে অন্যের গলায় আদর তুলে জোড়াহাঁস রাইয়ের পায়ে এসে বলে, আর বলো না আর বলো না -ওসব মিথ্যে কথার মালা!

হাঁসের শরীর ছুঁয়ে রাই বলে, মানুষের মন কী চায়, কাকে চায়, কেন চায়, জানে না বলেই মানুষের জীবনের একটা অংশ অজানা থেকে যায়। তাতে দুঃখ বাড়ে অন্যের।

আবার কারও জীবন দয়া-মায়ার সংসারে আটকে পড়ে থাকে, ঘাটে আঁটকে পড়ে থাকা পুরনো নৌকার মতো, ভালোবাসার বৈঠা পড়ে থাকে অন্তহীন আশায়। শূন্য-নৌকার বিষণ্নতায় ভরে থাকে সেই জীবন।

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকা জোড়াহাঁসকে রাই বলে, ভালো আছিস হংসমিথুন-দার্শনিকি মিথ্যে নেই, ছলচাতুরী নেই-মানুষের এই জীবন নেই।

মেঘ সরে আকাশে এখন রোদের ফোঁটা। রাই সেন্ট্রাল পার্ক থেকে বেরিয়ে আসে। রাইর ডাক শুনে কেউ আসবে না- সে জানে। তবুও রাই এলোমেলো পা ফেলে বাস-স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাস এলো বাস গেল, রাই দাঁড়িয়ে রইল যেমন করে অপেক্ষায় থাকার কথা ছিল।

কনকনে বাতাস চুপিচুপি যেন বলে যাচ্ছে-আসবে না, আসবে না, তুমি কি জানতে না মনের বন্ধন বলে কিছু নেই। নিষিদ্ধ ভালোবাসার বন্ধন অন্য বাধার কাছে হেরে যায়- জানতে না!

রাই ফিসফিস করে বলে, না- জানতাম না ভালোবাসাও নিষিদ্ধ হয়। বলেছিল আসবে, নদী সাঁতরে, বাধা এড়িয়ে বাস, ট্রেন, উড়াল জাহাজে! মিথ্যে ছিল- তবুও রাই পাতালের নিচে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে- অপেক্ষায়!

অপেক্ষায় থেকো না- যার আসার সে আসবে, যে আসবে না- সে তোমার অপেক্ষাতেও আসবে না। অন্ধকার ফুঁড়ে ভেসে আসা কথায় রাই চমকে উঠলো না। হোমলেস বৃদ্ধকে দেখে কাছে গেলো। হাতের ব্যাগ থেকে বের করে দিলো বয়ে আনা খাবার।

বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলল, গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড। রাই হাসল!

এক পা এগিয়ে আবার ফিরে গিয়ে ব্যাগ থেকে বের করে দিলো চীনামাটির নতুন কফি মগ। বলল, আমি একবার এতে চুমুক খেয়েছিলাম -ইচ্ছে করেই।

ব্যাগের ভিতরে থেকে খুব যত্নে বের করে দিলো নতুন পশমি শাল। বললো, এতেও আমার গায়ের একটু উষ্ণতা মাখা আছে।

রাই শূন্য ব্যাগ নিয়ে পা বাড়াতেই হোমলেস বৃদ্ধ হেসে বলল, সুইটহার্ট, এই উপহার যাকে দেবার তাকে না দিতে পারলেও আজকের দিনের স্মৃতি হিসাবে এ তোমার কাছেই থাক। এই মগে তোমার চুম্বনই মানায় ভালো, এই শাল যেমন তোমার শরীরে, অন্য কারও নয়। তোমার খাবার আমিই ভালোবেসে খাবো। আমি ক্ষুধার্ত মানুষ। কেউ খাবার দিলে খুশি হই আবার চেয়ে না পেলে অপমানিত বোধ করি না। তুচ্ছতাকে সহজে গ্রহণ করি। সুইটহার্ট, তোমার ভাবনায় যে অবহেলা হয়েছে তা অন্যের দুর্বলতা। তোমার জন্য এ কেবল একটি ঘটনা!

রাত বাড়ছে। এবার তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আমার দুঃখ তোমাকে আমার কিছুই দেওয়া হলো না।

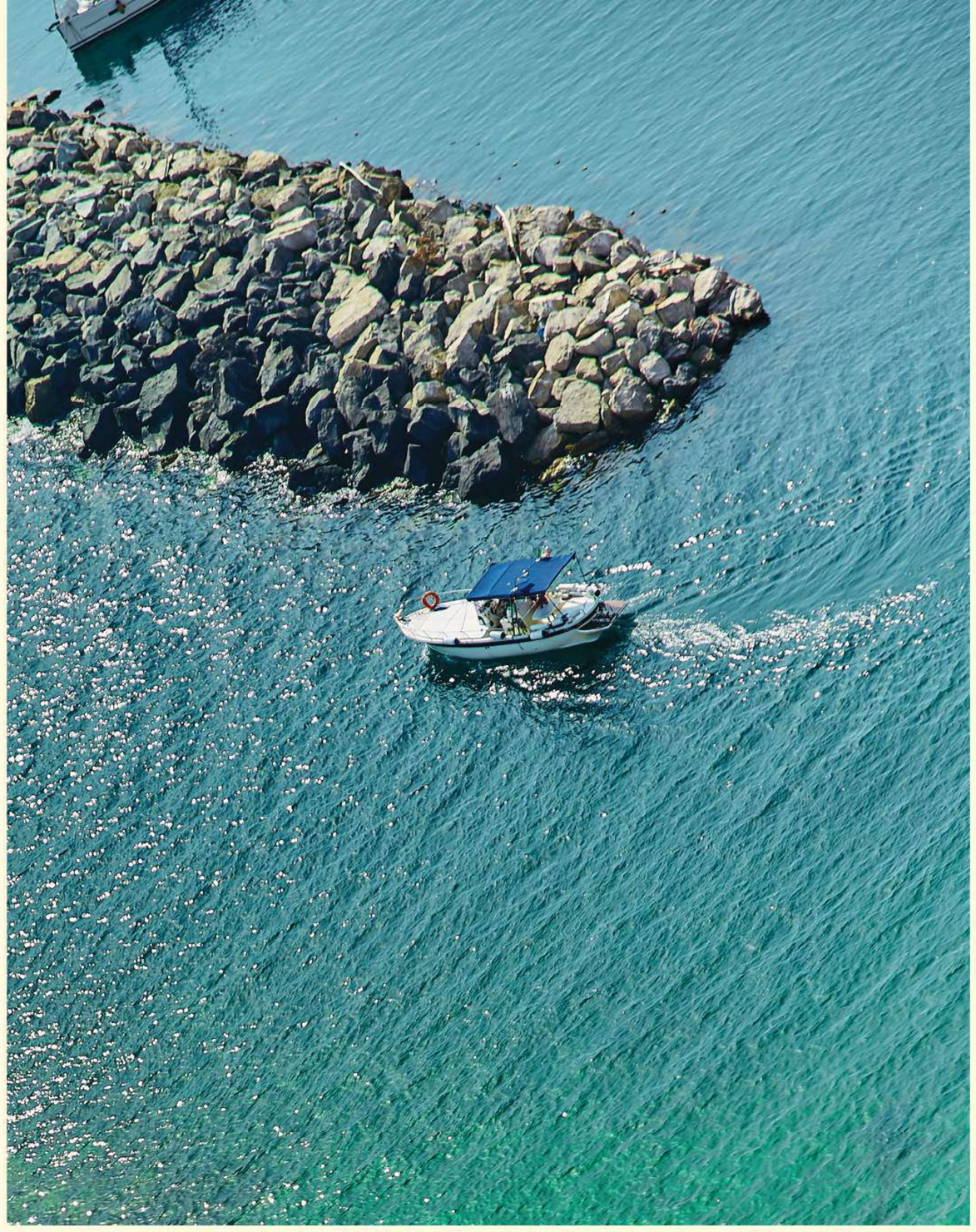

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরষ্কার ২০২১ কারা পেলেন

জাহান অরণ্য

১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর- ঢাকার বর্ধমান হাউস-এ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা একাডেমি। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের সূত্রে, তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা ভাষা এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে যে বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল, তারই অনুপ্রেরণায় জন্ম হয়েছিল বাংলা একাডেমির। তবে বাংলা একাডেমি গড়ার ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল আরও আগে।

বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের সাক্ষী। কিন্তু বাংলা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির চর্চার জন্য বাংলা ভাষা উপযুক্ত কিনা এ নিয়ে অনেকের সন্দেহ ছিল। এ সকল বিষয়ে অনেকে বাংলাতে গ্রন্থ রচনা করার পরও বাংলাভাষার এই জাতীয় তথাকথিত দুর্বলতা নিয়ে অনেকেই হীনমন্যতায় ভুগতেন। এই কারণে অনেকেই বাংলা ভাষা চর্চা এবং গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

১৯২৫ সালে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষায় জ্ঞানসাধনা ও সাহিত্যচর্চার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এ বিষয়ে তেমন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠে নি। ১৯৪০ সালে আবুল কাশেম ফজলুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্সে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, তৎকালীন বাংলা সরকারকে একটি অনুবাদ বিভাগ স্থাপনের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু এ অনুরোধও শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নি। ১৯৪৭ সালে পাকভারত বিভাজনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল বিভাজিত হয়ে যায়। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ নিজেদের মতো করে বাংলা ভাষা গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা শুধু উর্দুকে নির্বাচন করলে, বাংলা ভাষা একটি বড় ধরনের হুমকির মুখে পড়ে। ফলে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ও শিক্ষার ভাষা হিসেবে দাবি তোলা হয়। একই সাথে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিও তোলা হয়। এই আন্দোলনের ভিতরেই ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন হয়। এই সভার সভাপতির ভাষণে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলাভাষার গবেষণার জন্য একটি একাডেমি গড়ার কথা বলেন।

১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু নানা কারণে তা ব্যর্থ হয়। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন পূর্ববাংলা আইনসভার নির্বাচনে বিজয়ী হয় যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন-পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী প্রথম বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু ৩০শে মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। ফলে বাংলা একাডেমি স্থাপনের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৫৫ সালের নির্বাচনে দ্বিতীয় বার যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। এই নতুন সরকার ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউসে বাংলা

একাডেমির উদ্বোধন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী আবুল হোসেন সরকার। শুরুর দিকে প্রাদেশিক পূর্ববাংলা সরকার বাংলা একাডেমী পরিচালনার জন্য প্রথমে একটি প্রিপারেটরি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সম্পাদক ও স্পেশাল অফিসাররূপে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমসাময়িক জীবিত লেখকদের সামগ্রিক মৌলিক অবদান চিহ্নিত করে তাঁদের সৃজনী প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করাই বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য। বাংলা সাহিত্যের ১০টি শাখায় এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিটি পুরস্কারের মূল্যমান ৩,০০,০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা। প্রতি বছর মাসব্যাপী আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার প্রাপ্তদের পুস্কারের অর্থমূল্যের চেক, সম্মাননা পত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন।

১৯৬০ সালের ২৬ জুলাই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর দি বেঙ্গলি একাডেমি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এর মাধ্যমে একাডেমির কার্যক্রমে কিছু পরিবর্তন আসে। তাদের কার্যাবলি সংশোধিত হয়ে সাহিত্য পুরস্কার প্রদান এবং বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন এবং ফেলো, জীবনসদস্য ও সদস্যপদ প্রদান যোগ করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৬০ সাল থেকে বাংলা একাডেমি বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য পুরস্কার দিয়ে আসছে। সে বছর প্রথম বারের মত বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরষ্কার পেয়েছিলেন জনাব ফররুখ আহমদ (কবিতা) ২. জনাব আবুল হাশেম খান (উপন্যাস) ৩. জনাব আবুল মনসুর আহমদ (ছোটগল্প) ৪. জনাব আবদুল্লাহ্ হেল কাফী (প্রবন্ধ-গবেষণা) ৫. জনাব মোহম্মদ বরকতুল্লাহ (প্রবন্ধ-গবেষণা) ৬. জনাব আসকার ইবনে শাইখ (নাটক) ৭. খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন (শিশুসাহিত্য)

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২১ ঘোষণা করা হয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার জন্য এবার এ পুরস্কার পেয়েছেন ১৫ জন সাহিত্যিক। ২৩ জানুয়ারি বাংলা একাডেমির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের নাম ঘোষণা করা হয়। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার কমিটি ২০২১-এর সদস্যদের সম্মতিতে এবং বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

কথাসাহিত্যে এবার পুরস্কার পেলেন ঝর্ণা রহমান ও বিশ্বজিৎ চৌধুরী। ঝর্না রহমান ১৯৫৯ সালের ২৮শে জুন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো. মোফাজ্জল হোসেন এবং মা রহিমা বেগম। তার গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুর তথা মুন্সীগঞ্জ জেলার কেওয়ারে। একজন প্রথিতযশা বাংলাদেশি গল্পকার, কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সংগীতশিল্পী ও শিশুসাহিত্যিক হিসেনে তিনি সমাদ্রিত। আশির দশক থেকে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, নাটক, কবিতা, ছড়া, ভ্রমণ, শিশুসাহিত্য রচনা করে আসছেন। পেশাজীবনে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের বাংলা বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। তার রচনাবলীর মধ্যে উপন্যাস - পিতলের চাঁদ, গল্প- তপতীর লাল ব্লাউজ, কাব্যগ্রন্থ - জল ও গোলাপের ছোবল উল্যেখযোগ্য। বিশ্বজিৎ চৌধুরী ১৯৬০ সালের ১ আগস্ট চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর শেষ করে ১৯৮০-এর দশকের শুরুর দিকে তিনি লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। ১৯৮৬ সালে লেখালেখির পাশাপাশি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তার প্রথম শিশুতোষ গল্পগ্রহন্থ 'লিন্ডা জনসনের রাজহাঁস' ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা ও নাটকসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবদান রেখেছেন। তার অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে, বিবাহবার্ষিকী ও অন্যান্য গল্প (ছোটগল্প), সম্ভ্রমহানির আগে ও পরে (গল্পগ্রন্থ), মাঠের ওপারে যাবে, লীলা? (কাব্যগ্রন্থ), নার্গিস ও বাসন্তী (উপন্যাস), তোমার পুরুষ কোথায়? (উপন্যাস) প্রভৃতি।

হোসেন উদ্দীন হোসেন ২০২১ সালের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরষ্কার পেছেন প্রবন্ধ/গবেষণায় বিশেষ আবদানের জন্য। ১৯৪১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার কৃষ্ণনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিজের গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তিনি ঝিকরগাছা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন। পরে ১৯৫৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন। ১৯৫৫ সালে তার প্রথম কবিতা কলকাতার দৈনিক পত্রিকা 'লোকসেবক'এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে তার বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ হওয়া শুরু করে। ১৯৬৫ সালে তিনি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে, নষ্ট মানুষ, অমৃত বৈদেশিক, সাধুহাটির লোকজন, ইঁদুর ও মানুষেরা, প্লাবন এবং একজন নুহ, ভলতেয়ার ফ্লবেয়ার কলসত্ব ত্রয়ী উপন্যাস ও যুগমানস, ঐতিহ্য আধুনিকতা ও আহসান হাবীব, বাংলার বিদ্রোহ, সমাজ সাহিত্য দর্শন প্রবন্ধ, রণক্ষেত্রে সারাবেলা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, লোকলোকোত্তর গাঁথা কিংবদন্তি, বনভূমি ও অন্যান্য গল্প, অনন্য রবীন্দ্রনাথ।

কবিতায় আসাদ মান্নান ও বিমল গুহ পেয়েছেন এবারের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরষ্কার। আসাদ মান্নান ১৯৫৭ সালের ৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার সাতঘরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।পরবর্তীতে শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮১ সালে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে তিনি রাজশাহী বিভাগের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি সচিব পদমর্যাদায় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আসাদ ১৯৭০-এর দশক থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন আসাদ মান্নান। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ছারাও ১৯৭৭/৭৮ সালে বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, ২০০৮ সালে জীবনানন্দ দাস পুরস্কার, ২০১১ সালে কবিকুঞ্জ পদক, ২০১৩ সালে কবিতালাপ সম্মাননা ও পদক অর্জন করেন। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ - ভালোবাসা আগুনের নদী, তোমার কীর্তন, হে অন্ধ জলের রাজা ইত্যাদি। বিমল গুহ ১৯৫২ সালের ২৭ শে অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার বাজালিয়া ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা প্রসন্নকুমার গুহ এবং মাতা মানদাবালা। চার সন্তানের মধ্যে তিনি সবার বড়। তার নিজের গ্রাম বাজালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন। ১৯৭০ সালে সাতকানিয়া সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপরে বাংলা সাহিত্যে ১৯৭৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করেন এবং যুক্তরাজ্যের নেপিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা সংস্থার পরিচালক ও কলেজ পরিদর্শক ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধ্যয়ন বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন ১৯৬৮ সালে যখন তিনি স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তার প্রথম কবিতা "আকাশ" ১৯৬৯ সালে সাতকানিয়া সরকারি কলেজ সাময়িকী "রেশমী" তে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় নিয়মিত কাব্যচর্চা শুরু। ১৯৮২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অহংকার, তোমার শব্দ'। এ পর্যন্ত তার ১৫টি কবিতাগ্রন্থ, ৯টি কিশোর কবিতাগ্রন্থসহ মোট ৩৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো : 'অহংকার তোমার শব্দ,' 'সাঁকো পার হলে খোলাপথ', 'স্বপ্নে জ্বলে শর্তহীন ভোর', 'নষ্ট মানুষ ও অন্যান্য কবিতা', 'প্রতিবাদী শব্দের মিছিল', 'বিবরের গান', 'প্রত্যেকেই পৃথক বিপ্লবী', 'নির্বাচিত কবিতা', 'কবিতাসংগ্রহ'। বিমল গুহের প্রেম, স্নিগ্ধ ও সমকালীন কবিতাকে স্বদেশি প্রণোদনায় উন্মোচিত বলে আখ্যায়িত করেন অ্যামিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান।

কবি বিমল গুহ কবিতা ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়েও অবদান রেখেছেন। গবেষণা, সম্পাদনা, ভ্রমণগ্রন্থ রচনা এবং বহু প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন, যা বহুজন প্রশংসিত। তার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পেয়েছেন দেশি-বিদেশি অনেক পুরস্কার।

অনুবাদে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরষ্কার পেয়েছেন আমিনুর রহমান ও রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী। আমিনুর রহমান ১৯৬৬ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ থেকে এম-ফার্ম ডিগ্রী লাভ করেছেন। তার ছয়টি কবিতার সংকলন এবং তিনটি গল্পের সংকলন প্রকাশিত হ য়েছে। কবির কবিতা ইংরেজি, আরবী, স্পেনীয়, ইতালীয়, চীনা, মালয়, মঙ্গোলীয়, জার্মান, নেপালি, রুশ, উর্দু, ফরাসী, হিন্দী সহ ২৫টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আমিনুর রহমান সাহিত্য অনুবাদ এবং সাহিত্য পর্যালোচনার সাথে জড়িত। তার অনূদিত দশটি কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সার্ক অঞ্চলের সমসাময়িক সংক্ষিপ্ত গল্প এবং সার্ক অঞ্চল থেকে কবিতা (২০১১) সহ বেশ কয়েকটি সাহিত্য ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য। তিনি গ্রেট ব্রিটেন, ভারত, স্পেন, ইরাক, শ্রীলঙ্কা, কলম্বিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়া, নিকারাগুয়ায় কাব্য উতসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস ফেনী জেলার সদর উপজেলার শর্শদি ইউনিয়নে হলেও শৈশব কাটিয়েছেন ঢাকার পুরানা পল্টনে। কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করে তিনি স্প্যানীয় ভাষা ও সাহিত্যে স্পেনের গ্রানাদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। পরে তুলনামূলক সাহিত্যে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজে থাকাকালীন রফিক লেখালেখি শুরু করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন দৈনিকে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী, নাজমুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাদের ৩ সন্তান রয়েছে, জাহরা, রিফাত এবং জুমানা।

রফিকুর রশিদ শিশুসাহিত্যে পেয়েছেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরষ্কার ২০২১। রফিকুর রশীদ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ মেহেরপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গোলাম রসুল এবং মা রওশন আরা বেগম। গাংনী হাই স্কুল থেকে ১৯৭৩ সালে এসএসসি, মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ১৯৭৫ সালে এইচএসসি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সালে বাংলায় স্নাতক ও ১৯৮০ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর ১৯৮৩ সালে সিলেটের এক চা বাগানের সরকারী ব্যবস্থাপক

হিসেবে শুরু হয় তার কর্মজীবন। এরপরে মেহেরপুর জেলার গাংনী সরকারি কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন, এখানে থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। এরপর থেকে তিনি তিন যুগেরও অধিক সময় ধরে সাহিত্যচর্চা করেছেন। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে তিনি বহু নানামাত্রিক গল্প, উপন্যাস ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর গল্পে এ দেশের গ্রামজীবনের চিত্র ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে যা তাঁকে গল্পকার হিসেবে বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে। তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প ও উপন্যাস লিখেও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় পান্না কায়সার পেয়েছেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরষ্কার ২০২১। পান্না কায়সার ২৫ মে ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার আরেক নাম সাইফুন্নাহার চৌধুরী। তার স্বামী শহীদুল্লা কায়সার একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক এবং রাজনীতিক ছিলেন। পান্না কায়সার ঢাকায় এসেছিলেন প্রথম স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার পরে নিজের মত করে জীবন গুছিয়ে নিতে। তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। শিক্ষক হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন মুনির চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মত শিক্ষকদের। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে শহীদুল্লাহ কায়সার এর সাথে তার বিয়ে হয়। সেদিন ঢাকা শহরে কার্ফিউ ছিল। পুরো দেশ তখন গণআন্দোলনে উত্তাল। শহীদুল্লাহ কায়সার এর হাত ধরে তার পরিচয় আধুনিক সাহিত্যের সাথে, রাজনীতির সাথে। তার সংসার জীবন স্থায়ী হয় মাত্র দুই বছর দশ মাসের মত। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আলবদর বাহিনীর কজন সদস্য শহীদুল্লা কায়সারকে তার বাসা ২৯ বি কে গাঙ্গুলী লেন থেকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তিনি আর ফেরেন নি। এরপর পান্না কায়সার একা হাতে মানুষ করেছেন তার দুই সন্তান শমী কায়সার এবং অমিতাভ কায়সারকে। কিন্তু তিনি শুধু সংসার জীবনে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি শিশু কিশোর সংগঠন 'খেলাঘর' এর প্রেসিডিয়াম মেম্বার ছিলেন সেই ১৯৭৩ সাল থেকে। ১৯৯০ তে তিনি এই সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পান্না কায়সার ১৯৯৬-২০০১ সালের জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের একজন সাংসদ ছিলেন। তার দুই সন্তান, শমী কায়সার ও অমিতাভ কায়সার।

২০২১ সালে সাধনা আহমেদ নাটকে পেয়েছেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরষ্কার। সাধনা আহমেদ ১৯৭১ সালের ২৫ জুন কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যলায়ে থাকাকালীন তিনি আবৃত্তি দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছোটবেলায় নিজ শহরে খেলাঘর আসর নামক একটি সাংস্কৃতিক দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি নিজ শহরে 'স্পর্শ' নামে একটি আবত্তি পরিষদ গঠন করেন। ঢাকায় থাকাকালীন ১৯৯০-এর দশকে 'থিয়েটার আরামবাগের' সাথে যুক্ত হয়ে মঞ্চাভিনয় শুরু করেন। ১৯৯৭ সালে প্রথম টেলিভিশনের জন্য তিনি নাটক রচনা করেন। পরবর্তীতে টেলিভিশন ছাড়াও তিনি মঞ্চনাটক, কবিতা ও গল্প লেখা শুরু করেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য মঞ্চনাটকের মধ্যে রয়েছে দমের মাদার, ফাগুনশেষে, ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন, অংশুপট উপাখ্যান, বিপুল তরঙ্গ,গাঙকুমারী, বিরাঙ্গনার আঁচল ও প্রজন্ম'১৩ এবং 'সপ্তপর্ণী'। তিনি বর্তমানে 'ইন্টারন্যাশলাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট'-এর বাংলাদেশি অধ্যায়ের সাথে যুক্ত রয়েছেন।

হারুন-অর-রশিদের জন্ম পিরোজপুর জেলার কাউখালী উপজেলার আইরন গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার বি.এ. (অনার্স) এবং মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়, সুইডেন থেকে শান্তি ও সংঘাতের উপর গবেষণার একটি কোর্স সম্পন্ন করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য। ২০১৩ সালের ৬ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেন । জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে সিলেকশান গ্রেডের একজন অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি "বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চলের "সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গবেষণায় অবদান রাখার জন্য ২০২২ সালে তাকে "বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২১" প্রদান করা হয়।

আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনিতে সুফিয়া খাতুন ও হায়দার আকবর খান রনো পেয়েছেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরষ্কার ২০২১। সুফিয়া খাতুন ১৯২২ সালের মে মাসে ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে' ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়। ২০০৬ সালে শিশু-কিশোরদের জন্য রচনা করেন 'সোনা ঝরা দিন' নামে একটি গ্রন্থ। এছাড়াও 'আপনভূবন' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তার দীর্ঘ প্রবাস জীবন নিয়ে লিখিত গ্রন্থের নাম 'প্রবাসের প্রাপ্তি' যা ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়। ২০১৮ সালে তার আরও একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় যার নাম 'নারীর চোখে জল'। হায়দার আকবর খান রনো ১৯৪২ সালের ৩১ আগস্ট ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। রনোর পৈতৃক নিবাস নড়াইলের বরাশুলা গ্রামে। তার মা কানিজ ফাতেমা মোহসীনা বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। তার বাবা হাতেম আলী খান ছিলেন সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী। গণসংস্কৃতি ফ্রন্টের প্রয়াত সভাপতি হায়দার আনোয়ার খান ঝুনো তার অনুজ। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ সৈয়দ নওশের আলী তার নানা।

শুভাগত চৌধুরী - ১৯৪৭ সালে সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। সিলেটে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। কলকাতায় শান্তিনিকেতনেও কিছুকাল পড়ালেখা করেন। পরে চিকিৎসা বিষয়ে আগ্রহী হয়ে চিকিৎসাবিদ্যায় পড়ালেখা করেন। কর্মজীবনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডিন এবং পরে একই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪ সালে সরকারি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর বারডেমসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। শুভাগত নিউইয়র্ক সায়েন্স একাডেমীর নির্বাচিত সদস্য। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তিনি অসংখ্য গ্রন্থ, গবেষণা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার গবেষণার মূল বিষয় প্রাণরসায়ন, পুষ্টি ও চিকিৎসা-শিক্ষা পদ্ধতি। বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান/পরিবেশবিজ্ঞান শাখায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ২০২১ সালের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার অর্জন করেন।

লোককথায় আমিনুর রহমান সুলতান পেয়েছেন এবারের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার। আমিনুর ১৯৬৪ সালের ৩১

ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলার কাঁচামাটিয়ার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার খৈরাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আজিজুর রহমান এবং মাতা খোদেজা খাতুন। আমিনুর রহমান সুলতান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ১৯৮৭ সালে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৮৮ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এবং ২০০১ সালে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ করেন। বর্তমানে বাংলা একাডেমির ফোকলোর বিভাগের উপ-পরিচালক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। ফোকলোরে বিশেষ অবদানের জন্য ২০২১ সালের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার অর্জন করেন।

বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা ২০২২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার দেন। ১৯৬০ সাল থেকে এ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য ৩ লাখ টাকা। এছাড়াও পুরস্কারপ্রাপ্তদের সম্মাননা পত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

তথ্যসূত্র

- বাংলাপিডিয়া
- উইকিপিডিয়া
- বাংলা একাডেমির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"- বাংলা একাডেমি। ঢাকা, বাংলাদেশ।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যে বাঙালি কমিউনিটি তাদেরকে একটি পরিবারের বন্ধনে আবদ্ধ করার মহৎ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যাত্রা শুরু করেছিলো চ্যানেল ৭৮৬ ডট কম। শুরুতে এর নাম ছিলো এফ এম ৭৮৬। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসবাস করা বাঙালি কমিউনিটি,বিশেষ করে নিউইয়র্কে বসবাস করা বাংলাদেশিরাই চ্যানেল-৭৮৬ এর প্রাণ। এখানকার কমিউনিটির সুখে দুঃখে পাশে থাকার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।

চ্যানেল-৭৮৬, যাত্রা শুরুর অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে দর্শক-শ্রোতার ভালোবাসা পাওয়া একটি কমিউনিটি নিউজ নেটওয়ার্ক। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালি কমিউনিটির সেতুবন্ধ এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। বিশেষ করে নিউইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটিকে এক সুতোয় গেঁথেছে চ্যানেল-৭৮৬ । সর্বশেষ সংবাদ আর সুস্থ বিনোদন সমৃদ্ধ বিভিন্ন অনুষ্ঠান মাধ্যমে যুক্ত করেছে সব শ্রেণির দর্শক-শ্রোতাকে।

প্রায় ৪ বছর আগে প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনা করা হলেও মূলত গত রমজান তথা ২০২০ সালের মে মাস থেকে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় এফ এম ৭৮৬ নামে। নিউইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক,শিক্ষক,ইসলামিক স্কলার ও সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় রেডিও ব্যাক্তিত্ব জাহান অরণ্যর হাত ধরে এর যাত্রা । হাটি হাটি পা পা করে বর্তমানে এর কলেবর অনেক বেড়েছে। নিউইয়র্কের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকেও যুক্ত আছেন এক ঝাঁক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ সাংবাদিক।

বাংলা ভাষাভাষী পৃথিবীর সব মানুষের জন্য হলেও এর কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় বাঙালি কমিউনিটি থাকে চ্যানেল-৭৮৬ এর যে কোনো প্রচারের সর্বাগ্রে। ১৫০-১৫ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, কুইন্স, নিউইয়র্ক-১১৪৩২ এ প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানায় চ্যানেল-৭৮৬ এর দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন এর নিবেদিতপ্রান কর্মীরা। যদিও নিউইয়র্কে প্রচুর বাঙালির বসবাস, তবু এখনো তাদেরকে বসবাস করতে হয় নানা বৈষম্যকে সঙ্গী করে। আর সেজন্যই তাদেরকে মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে চ্যানেল-৭৮৬। কমিউনিটির নানা আঞ্চলিক সংগঠনকে দর্শক-শ্রোতার কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়া, তাদের বিভিন্ন উদ্যোগকে প্রচার করার কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে আসছে এই কমিউনিটি নিউজ নেটওয়ার্ক।

বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে যারা জনপ্রতিনিধি হওয়ার লড়াইয়ে নামেন, প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সর্বাত্মকভাবে তাদের পাশে থাকে চ্যানেল-৭৮। এছাড়া

এখন পর্যন্ত কমিউনিটির ২০টিরও বেশি অনুষ্ঠানে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে কাজ করেছে এই সংবাদ প্রতিষ্ঠান।

জীবনঘনিষ্ঠ নানা আয়োজনের কারণেই ইতোমধ্যে আস্থা অর্জন করতে পেরেছে। শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকে না চ্যানেল-৭৮৬ এর কার্যক্রম। সময়ের প্রয়োজনে, দর্শক-শ্রোতার চাহিদা মাথায় রেখে হাতে নেওয়া হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। এই যেমন বিজয়ের মাসের (ডিসেম্বর) বিশেষ আয়োজন হিসেবে ছিল 'আমার মুক্তিযুদ্ধ'। প্রবাসে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শোনান মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার গল্পগাঁথা। এর বাইরে আরও কিছু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শক শ্রোতার মন জয় করে নিয়েছে নিউইয়র্ক থেকে প্রচারিত এই কমিউনিটি নিউজ নেটওয়ার্ক। এছাড়া বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম আছে পরিকল্পনাধীন।

চ্যানেল-৭৮৬ আছে দৃষ্টিনন্দন ওয়েব নিউজ পোর্টাল। দেশ-বিদেশের সর্বশেষ খবর প্রকাশিত হয় এই পোর্টালে। নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বাঙালি কমিউনিটির সংবাদ প্রচার করা হয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে।

৬ মাসের কিছু বেশি সময়ের পথচলায় চ্যানেল-৭৮৬ এর আছে ১ লাখ ফলোয়ার সমৃদ্ধ ফেসবুক পেইজ। ৪ হাজার ৫০০'র অধিক সাবসক্রাইবার সমৃদ্ধ ইউটিউব চ্যানেল। ফেসবুক ছাড়াও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় আছে সক্রিয় পেইজ।

প্রাইম নিউজ
কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স
নিউইয়র্ক ডায়েরি
বিশ্বগণমাধ্যম শিরোনাম
প্রেমিডিন্সিয়াল ইলেকশন অ্যাওয়ার্ড
আমার মুক্তিযুদ্ধ
স্টুডিও নিউইয়র্ক
আপনার জিজ্ঞাসা
প্রবাস তারকা
নাশিদ টাইমস
স্বাস্থ্য সুরক্ষা
তারুণ্যের বিজয় ভাবনা
বিজয়ের গল্প
মিক্সটি মিনিটস উইথ
এমএম মোনাইমান
হ্যালো প্যারিস
গেট আউট এন্ড ভোট
হ্যালো ইজিপ্ট
বরকতময় রমজান
খতমে কোরআন
আজকের তারাবি
দরসে হাদিস

দ্যা স্মল কাইন্ডনেস
ইয়ুথ টক
জেনে নিন
থট অব রমাদান
দাওয়াহ অব রমাদান
কলিং টু পিস
নূরের খেয়া
রমাদান কুইজ
মাওয়ালে ও জাওয়াব
হ্যালো মদিনা
ইসলাম জানা অজানা
জুমার খুতবা
আমরা তোমাদের ভুলবোনা
একাত্তরের দিনগুলি
সুন্দর জীবনের জন্য
হাদিস ও কুরআন
কংক্রিটের কাব্য

CHANNEL 786
COMMUNITY NEWS NETWORK

150-15 Hillside Ave, Jamaica Queens, New York 11432
Phone : +1 212-729-0610, +1 (718) 355-9232

দেখুন
শুনুন
এবং পড়ুন
www.channel786.com

প্রবাসে বাংলাচর্চা নিয়ে আলাদা করে আমার দুশ্চিন্তা নাই যদি না ভাষা-ব্যবহারকারীরা নিজ ভাষা-সাহিত্য নিয়ে কোনো কর্তব্য ঠিক করেন। প্রচুর জাতির সদস্য আছেন যাঁরা পরবাসকালে স্থানীয় ভাষা-সাহিত্য-চলচ্চিত্রের অধিক পাঠক-দর্শক বানানোর কাজটা করেন। সেটা যদি কারো আগ্রহ না হয়, বাড়িতে কী ভাষায় দৈনন্দিন যোগাযোগ করছেন তা আমার জন্য বাংলাচর্চার প্রসঙ্গ নয়।

—বন্যা মির্জা, অভিনয়শিল্পী

প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে প্রবাসী হয়ে দেখেছি 'প্রবাসে বাংলা চর্চা'র ছিঁটেফোঁটাও নেই। পরে হাতে লিখে ঢাকার পত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে ডাকযোগে ছাপানো পত্রিকা পাবার অপেক্ষা- বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেটা ছাপাই হতো না। এখন ইন্টারনেটের কল্যানে সব ব্যবধান ঘুচে গিয়ে লেখক পাঠক প্রকাশক সবাই সর্বত্র মুখোমুখি বিরাজিত - তাই "প্রবাসে বাংলা চর্চা'কথাটা অস্তিত্বহীন।

—হাসান মাহমুদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

নিজের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য কিংবা কৃষ্টি বিদেশ বিভুঁইয়ে লালন বা পালন দুইই দুরূহ। তবুও এই দূর পরবাসে যাদের মননে আর গহীনে এসবের বসবাস তাদের এহেন কর্মকান্ডে আমি আপ্লুত হই, শেকড় খুঁজে পাই।

—খাইরুল ইসলাম পাখি, নাট্যজন

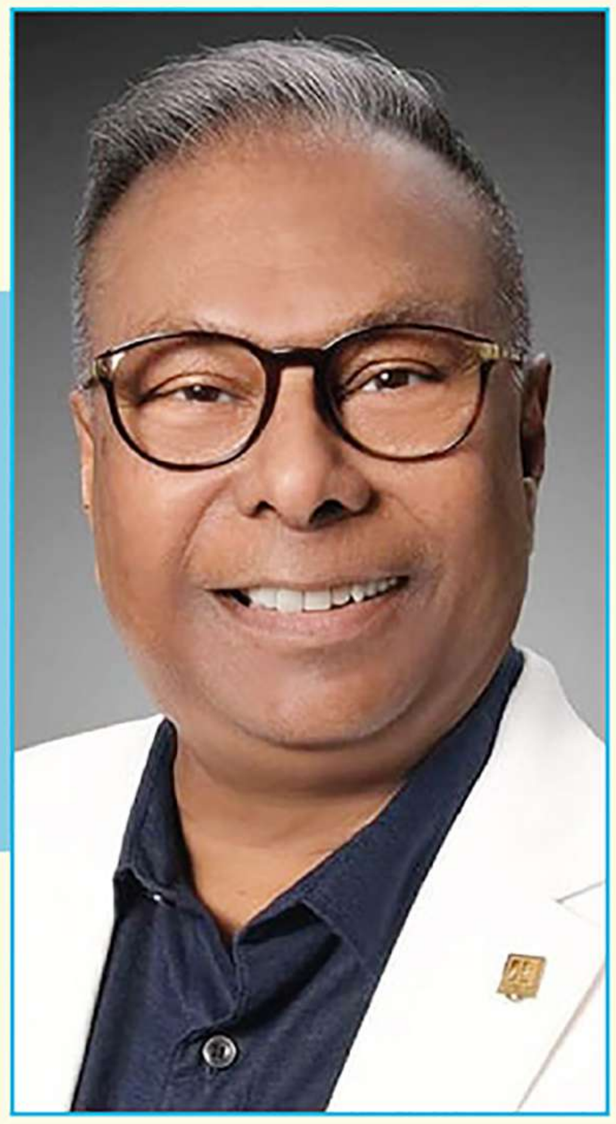

প্রবাসে তথা উত্তর আমেরিকায় বাংলা চর্চা বলতে গেলে সীমাবদ্ধ বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত এলাকাতেই। তার মধ্যে নিউইয়র্ক শীর্ষে। একটি বড়ো অবদান রাখছে বিভিন্ন বাংলা পত্র পত্রিকা। আমার জানা মতে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রায় ২০টি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বাংলা চর্চায় ভূমিকা রাখছে, ক্লাব সনম, ঊনবাঙাল, বিপা, বাফা এই সংগঠনগুলো উল্লেখ্যোগ্য।

—খন্দকার তৌফিক কাদের, সাংস্কৃতিক সংগঠক

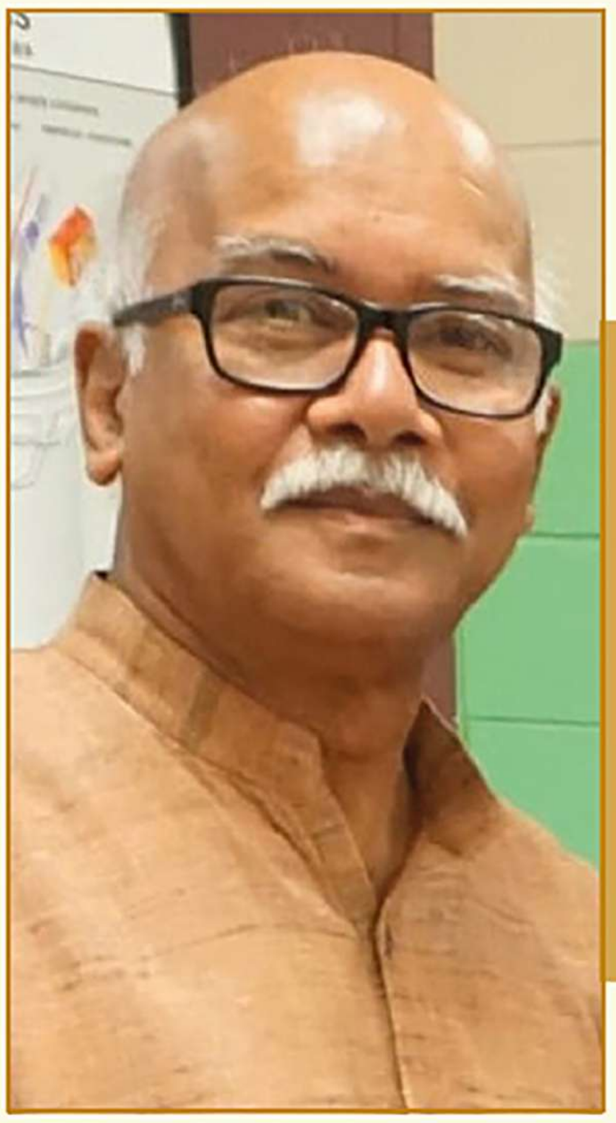

মরুভূমির লু হাওয়ায় এক ঢোক জল সবটুকু তৃষ্ণা মেটায় না জানি- কিন্তু প্রাণের ফল্গুধারাটি অব্যাহত রাখে। অভিবাসের শিল্পসাহিত্যও তেমনি আমাদের তৃষিত জীবনের পাথেয় ও মনরাঙানি কড়ি- যা হয়তো যথেষ্ট নয়, তবুও জীবনদায়ী। আমার সুদীর্ঘকাল প্রবাস জীবনে এইটুকু তৃষ্ণা যারা মিটিয়েছেন,যারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব ধরে রাখার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন, আমি তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

—ফেরদৌস নাজমী, গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা

KARNAFULLY
TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA
arc
Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্নফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

খলিল বিরিয়ানী হাউস

স্বাদ মাশাল্লাহ

দেশীয় খাবারের সবটুকু
আয়োজন নিয়ে নতুন রূপে

khalilbriyani /

Khalil's Food

Cooked By Certified Chef-
Md Khalilur Rahman

Zakir Tax & Accounting

Maximum Refund Guaranteed

ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন, সিটিজেনশীপ, ফুডষ্ট্যাম্প
এপ্লিকেশন ইত্যাদি এর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্টান।

- PERSONAL TAXES
- SELF-EMPLOYED TAXES
- SALES TAXES
- CORPORATION TAXES
- CORP. REGISTRATION
- PAYROLL
- BOOK-KEEPING
- ACCOUNTING

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

*NO HIDDEN FEES

929-207-1516

1506 Castle Hill Ave, 2nd Floor, Bronx, NY-10462

zakirfinancials@gmail.com

WE ARE OPEN 7 DAYS

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে
সকল ভাষা শহীদের প্রতি রইলো বিনম্র শ্রদ্ধা

SYED AL AMIN RASHEL

President: Carexue, Travelmate
Tandra International

Managing Editor: banglakhobar.net

Transf tech
ACADEMY

LIVE LIFE IN EASE !

BECOME A
QA ENGINEER IN
16 WEEKS
AND FULFILL THE DREAMS
THAT YOU DESIRE WITH A
SIX-DIGIT SALARY!

LANGUAGE IS THE GUIDE OF A CULTURE

Warm wishes on International Mother Language Day

আটলান্টায় বেড়াতে আসার আমন্ত্রণ রইল

Holiday Inn®

4401 Chamblee Dunwoody Rd.
Atlanta, GA 30341
Tel: 678-380-3700

১৫০–১৫, হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা
কুইন্স, নিউইয়র্ক এন ওয়াই – ১১৪৩২ যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত।
ফোন: (২১২) ৭২৯-০৬১০, নিউজ রুম: channel786news@gmail.com